মূল্য ঃ ১০.০০ টাকা

'ওরে তুই ভাবমুখে থাক্' —শ্রীশ্রীজগদম্বা

৭৪তম বর্ষ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ শ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেব

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (কাঁচের মন্দির)

২, প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, কোলকাতা- ৭০০ ০৩৬

সূচীপত্র

সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যপ্রকাশানন্দ ❑ যুগ্ম সহ-সম্পাদক ঃ স্বামী সুবোধানন্দ ও অরুণ কুমার

প্রতি সংখ্যা ঃ দশ টাকা মাত্র ❑ যান্মাসিক ঃ পঞ্চাশ টাকা মাত্র ❑ বার্ষিক মূল্য ঃ সডাক একশ টাকা মাত্র

যেমন ফুল নাড়তে-চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবৎ-তত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।

—শ্রীমা সারদাদেবী

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

নবীকরণ ও গ্রাহক ভুক্তি

১৪২৭ বঙ্গাব্দ

'ভাবমুখে'

৭৪ তম বর্ষ, বৈশাখ ১৪২৭ (২০২০-২১) সালের জন্য আপনি 'ভাবমুখে'-এর নবীকরণ করেছেন কি? না করে থাকলে অবিলম্বে করে নিন।

'ভাবমুখে' পত্রিকার নিয়মাবলী

-ঃ গ্রাহক/গ্রাহিকাদের প্রতি ঃ-

❊ 'ভাবমুখে' মাসিক পত্রিকা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের মুখপত্র। বর্ষ শুরু বৈশাখ মাসে। প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। আশ্বিন সংখ্যাটি বিশেষ সংখ্যা।

❊ গ্রাহক মূল্য ঃ বৈশাখ ১৪২৭ থেকে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য সডাক—১০০.০০ টাকা, ভারতের বাইরে বিমান যোগে—১৫০০.০০ টাকা, আজীবন—৩০০০.০০ টাকা, প্রতি সাধারণ সংখ্যা—১০.০০ টাকা, ষান্মাসিক — ৬০.০০ টাকা। বিশেষ সংখ্যার জন্য গ্রাহকদের অতিরিক্ত কোন মূল্য দিতে হয় না। নমুনার জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠাতে হবে।

❊ বছরের যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়, কিন্তু কমপক্ষে ৬ মাসের গ্রাহক হলে সুবিধাজনক হয়। বার্ষিক চাঁদা বছরের প্রথমে অগ্রিম দিতে হবে।

❊ আজীবন গ্রাহকদের ক্ষেত্রে এককালীন অথবা বারোমাসের মধ্যে চারবার কিস্তিতে মোট ৩০০০.০০ টাকা দিতে হবে। প্রথম কিস্তিতে ৫০০.০০ টাকা দিতে হবে। ৩০ বছর অন্তে পুনরায় নবীকরণ করতে হবে।

❊ বার্ষিক চাঁদা বৈশাখ মাসের মধ্যে মানি-অর্ডার যোগে, গ্রাহকের নাম, ঠিকানা, গ্রাহক সংখ্যা মানি অর্ডার ফর্মের নীচের অংশে পরিষ্কার করে লিখে ভাবমুখে, পত্রিকা সচিব, ২নং প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, কলকাতা-৭০০ ০৩৬, (ফোন ঃ ৯৮৩৬২৪১৫৪৮, ৯২৩০৬১২৮১৭) email : kanchermandir@gmail.com এই ঠিকানায় প্রেরণ করবেন। নতুন গ্রাহক হলে—'ভাবমুখে'র 'নতুন গ্রাহক হতে চাই' কথাটি অবশ্যই উল্লেখ করবেন। চেক বা ড্রাফ্‌ট পাঠালে 'Bhabumkhey' এই শিরোনামে পাঠাবেন।

❊ ভাবমুখের নতুন গ্রাহক হওয়ার জন্য বা পুনর্নবীকরণের জন্য ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা জমা দিলে মোবাইলে মেসেজ বা হোয়াটস্ অ্যাপ-এ নাম, ঠিকানা ও কারণ অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

Bank Details Only for Bhabmukhey : Head of Account - BHABMUKHEY, Name of Bank - United Bank of India, Baranagar Branch, A/C. No. - 0078010030759, IFSC No. - UTBI0BNG102

❊ ডাকযোগে প্রেরিত পত্রিকা উপযুক্ত সময়ে না পেলে প্রথমে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ নেবেন এবং পরে গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করে অফিসে জানাবেন।

❊ গ্রাহক/গ্রাহিকার ঠিকানা পরিবর্তন হলে চিঠিতে পুরানো এবং নতুন দুটি ঠিকানাই উল্লেখ করে ইংরাজী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে কার্যালয়ে জানাবেন। চিঠির উত্তর চাইলে রিপ্লাই কার্ড পাঠাবেন।

❊ পুনর্নবীকরণের সময় গ্রাহক নম্বর এবং গ্রাহক/গ্রাহিকার নাম অবশ্যই উল্লেখ করবেন।

২২শে জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭ (ইং ৫ই জুন ২০২০) শুক্রবার জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা। পূর্ণিমার ব্রতোপবাস। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা।
পূর্ণিমা তিথি পূর্ব রাত্রি ঘ. ৩।১৬ থেকে রাত্রি ঘ. ১২।৪২ পর্যন্ত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-নারায়ণ পূজা।
৩রা আষাঢ় ১৪২৭ (ইং ১৭ই জুন ২০২০) বুধবার একাদশীর ব্রতোপবাস। একাদশীর হোম।
একাদশী তিথি—পূর্ব প্রাতঃ ৫।৪১ থেকে দিবা ঘ. ৭।৫১ পর্যন্ত।
৬ই আষাঢ় ১৪২৭ (ইং ১৭ই ২০শে জুন ২০২০) শনির অমাবস্যার রাত্রে হোম।
অমাবস্যা তিথি—দিবা ঘ. ১১।৫২ থেকে আরম্ভ।
৭ই আষাঢ় ১৪২৭ (ইং ২১শে জুন ২০২০) রবিবার অমাবস্যার ব্রতোপবাস। অমাবস্যা তিথি—ঘ. ১২।১১ পর্যন্ত।
অম্বুবাচী প্রবৃত্তি (আরম্ভা)—রাত্রি ঘ. ১১। ২৮ আরম্ভ। বলয় গ্রাস সূর্যগ্রহণ ভারতবর্ষে দৃশ্য।
গ্রহণ স্পর্শ—দিবা ঘ. ৯।১৬। বলয় গ্রাস আরম্ভ—দিবা
ঘ. ১০।১৯ মি. থেকে বলয় গ্রাস সমাপ্তি—দিবা ঘ. ২।০২ মি.।
৯ই আষাঢ় ১৪২৭ (ইং ২৩শে জুন ২০২০) মঙ্গলবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ যাত্রা।
১১ই আষাঢ় ১৪২৭ (ইং ২৫শে জুন ২০২০) বৃহস্পতিবার অম্বুবাচী নিবৃত্তি দিবা ঘ. ১১।১৮ গত।
১৩ই আষাঢ় ১৪২৭ (ইং ২৭শে জুন ২০২০) শনিবার শ্রীশ্রীবিপত্তারিণী ব্রত।
১৭ই আষাঢ় ১৪২৭ (ইং ১লা জুলাই ২০২০) বুধবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের উল্টো রথ। একাদশীর ব্রতোপবসা।
একাদশী হোম। একাদশী তিথি—পূর্ব রাত্রি ঘ. ৭।৫০ মি. থেকে অপঃ ঘ. ৫।৩০ পর্যন্ত।
২০শে আষাঢ় ১৪২৭ (ইং ৪ঠা জুলাই ২০২০) শনিবার পূর্ণিমার রাত্রে হোম। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-নারায়ণ পূজা।
পূর্ণিমা তিথি—দিবা ঘ. ১১।৩৪ থেকে আরম্ভ।
২১শে আষাঢ় ১৪২৭ (ইং ৫ই জুলাই ২০২০) রবিবার গুরু পূর্ণিমা। শ্রীশ্রীব্যাস পূজা। বিশেষ পূজা ও হোম।
২৬শে আষাঢ় ১৪২৭ (ইং ১০ই জুলাই ২০২০) শুক্রবার শ্রীশ্রীনাগ পঞ্চমী। শ্রীশ্রীমনসাদেবী ও অষ্টনাগ পূজা।
পঞ্চমী তিথি পূর্ব দিবা ঘ. ১০।১২ থেকে দিবা ঘ. ১১।৩৯ পর্যন্ত।
৩২শে আষাঢ় ১৪২৭ (ইং ১৬ই জুলাই ২০২০) বৃহস্পতিবার একাদশীর ব্রতোপবাস। একাদশীর হোম।
একাদশী তিথি—পূর্ব রাত্রি ঘ. ১০।২০ থেকে রাত্রি ঘ. ১১।৪৫ পর্যন্ত।
৪ঠা শ্রাবণ ১৪২৭ (ইং ২০শে জুলাই ২০২০) সোমবার অমাবস্যার ব্রতোপবাস ও অমাবস্যার হোম।
অমাবস্যার তিথি পূর্ব রাত্রি ১২।১০ থেকে রাত্রি ঘ. ১১।৩ পর্যন্ত।
৯ই শ্রাবণ ১৪২৭ (ইং ২৫শে জুলাই ২০২০) শনিবার নাগ পঞ্চমী।
পঞ্চমী তিথি—পূর্ব দিবা ঘ. ২।৩৪ থেকে দিবা ঘ. ১২।৩ পর্যন্ত।
১৪ই শ্রাবণ ১৪২৭ (ইং ৩০শে জুলাই ২০২০) বৃহস্পতিবার একাদশীর তিথি। শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা (শ্রীশ্রীগোপালজীর)
আরম্ভ। একাদশীর তিথি—পূর্ব রাত্রি ঘ. ১।১৭ থেকে রাত্রি ঘ. ১১।৫০ পর্যন্ত।
১৭ই শ্রাবণ ১৪২৭ (ইং ২রা আগষ্ট ২০২০) রবিবার পূর্ণিমার হোম।
১৮ই শ্রাবণ ১৪২৭ (ইং ৩রা আগষ্ট ২০২০) সোমবার শ্রাবণী পূর্ণিমা (ঝুলন পূর্ণিমা)। শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা সমাপন।
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-নারায়ণ পূজা। পূর্ণিমা তিথি—পূর্ব রাত্রি ঘ. ৯।২৯ থেকে রাত্রি ঘ. ৯।২৯ পর্যন্ত।
২৭শে শ্রাবণ ১৪২৭ (ইং ১২ই আগষ্ট ২০২০) বুধবার শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রত।
অষ্টমী তিথি—পূর্ব দিবা ঘ. ৯।৭ থেকে দিবা ঘ. ১১।১৭ পর্যন্ত।
রোহিনী নক্ষত্র—পূর্ব রাত্রি ঘ. ৩।২৬ থেকে আরম্ভ (অহোরাত্র)।
৩০শে শ্রাবণ ১৪২৭ (ইং ১৫ই আগষ্ট ২০২০) শনিবার একাদশীর ব্রতোপবাস। একাদশীর হোম।
একাদশী তিথি—পূর্ব দিবা ঘ. ২।২ থেকে দিবা ঘ. ২।২১ পর্যন্ত।

শ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেব প্রতিষ্ঠিত

চুয়াত্তর বর্ষ	চৌদ্দশ' সাতাশ	জ্যৈষ্ঠ + আষাঢ়	২য় + ৩য় সংখ্যা

গান

শ্রীঠাকুর

মেঘ কজ্জ্বল বনানীর মেদুর ছায়ে
উচ্ছল ক(ণায় দুকূল দুলায়ে
শ্যামায়িত হল বুঝি শ্যামল আঁখি
জল ভরা আকুলিত বেদন সেকি
বটের বেণু-ঝরা নিমিল পায়ে।।
হারাতে চেয়েছ মেঘে বিজলী রাকা
বলাকার বিধুনিত উদাস পাখা
লুটায়ে ধরেছ তবু আদুল গায়ে।।

—০—

;

সম্পাদকীয়

ভাবনা সে তো ফাঁকীর বোঝা/মিছে কেন মরিস ভেবে...বিখ্যাত গানের একটা লাইন। বললেই তো হল না; জীবনে তা প্রয়োগ করতে হয়। তা না হলে ফল বোঝা যায় না। ভাবই হচ্ছে সব—জ্ঞান, বিচার, সৎ-অসৎ, সুখ-দুঃখ, ভূত-ভবিষ্যৎ সকলই শরীর ও মনে ছায়া ফেলে। সেখানে ভাবের সঞ্চার হয়।

আমাদের ভাবনাগুলোকে সব সময় বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। তা না হলে সব ঠিক ঠিক বোঝা যাবে না। জপ করতে হবে, ধ্যান করতে হবে, একজায়াগায় বসে নির্দিষ্ট সময়ে পূজা করতে হবে, ..., তবেই ঈশ্বর লাভ হবে, কিন্তু চারপাশের মানুষ, গাছপালা, পশুপাখীরা যে রয়েছে, তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে—একথাগুলো মনে আসে না। ঈশ্বর তো যা কিছু ব্যক্ত-অব্যক্ত সবের মধ্যে রয়েছেন। সকলের সঙ্গে একটা আত্মিক সম্পর্ক করে নিতে হয়। আমাদের এ দিকটা একেবারেই খেয়াল থাকে না। বারবার বলে দিলেও, অভ্যাস করি না।

স্বামী বিবেকানন্দের একটা বাণী আছে না—''বল, মূর্খ ভারতবাসী আমার ভাই, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই....'' আমরা এই কথাগুলি বারবার বললেও নিজেদের জীবনে অভ্যাস করিনি। করলে আমাদের দেশের চেহরা পালটে যেত। ঈশ্বরে ভালবাসা সহজ না শক্ত, তাও কি কোনদিন ভেবে দেখেছি? ভাবটাই আসল।

যে ভাব নিয়ে কর্ম করা হবে মনে সেই ভাবেরই ছাপ পড়বে। যেমন স্বার্থ ভাব নিয়ে কর্ম করলে মনে সংকীর্ণতার ভাব আসবে। ধীরে ধীরে মনের প্রসারতা কমে আসবে। আর যদি নিঃস্বার্থ ভাবে কর্ম করা যায় তবে তা মনের প্রসারতা বাড়াবে। যেখানেই সংকীর্ণতা সেখানেই পাপ এবং যেখানেই প্রসারতা সেখানেই ধর্ম।

ভাব যদি রজোগুণাত্মক হয়, বাসনাযুক্ত হয় তবে তা বন্ধনের কারণ হবে। আর যদি কর্ম সত্ত্বগুণাত্মক হয়, বাসনা মুক্ত হয় তবে তা মুক্তির কারণ হবে। ঈশ্বরের সাথে যুক্ত হয়ে কর্ম করলেই আর ভয় থাকে না। বাসনা মুক্ত হলেই সব হল। মা বলেছেন, ''সব সাধনার শেষ সাধনা নির্বাসনা।'' এরজন্য দরকার আমাদের ভাবনাকে ভূমার সাথে যুক্ত করা। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, যো বৈ ভূমা তদমৃতমথযদল্পং তন্মর্ত্যং অর্থাৎ যিনি ভূমা বা মহান তিনিই অমৃত আর যা অল্প তা বিনাশী।

শ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেব বলেছেন, ''আমাদের যতক্ষণ ভূমার দিকে দৃষ্টি না পড়ছে, আমরা সীমার মধ্যে থাকি, ততক্ষণ এটা সেটা নিয়ে থাকি, যেমন ছেলেবেলায় একরকম চলে, এদিক ওদিক করি, কিন্তু যদি eternal বা অসীমএ ফেলে দিই, অনন্ত দেশকাল সমুদ্রে ফেলে দিই তাহলে একদিন না একদিন ব্রহ্মাবগাহী হব, ভগবৎলাভ করব। এর একটা বৈজ্ঞানিক দিক আছে। যেমন ছেলেবেলায় পড়াশুনা, এদিক ওদিককরতে করতে ক্রমে বড় হলে একটা দিক ঠিক হয়ে যায়, তেমনি তার vector এদিক ওদিক করে একটা কোন নির্দিষ্ট দিক নেয়, কিন্তু যখন বিরাট দেশকালে অনন্ত গতিভঙ্গীতে ফেলে দিই, তখন একটা তার নিত্য গতিভঙ্গী, invariable গতিভঙ্গী পাওয়া যায়, তেমনি আমাদের মনের গতিকে যদি অনন্ত দেশকালের মধ্যে ফেলে দিই, তাহলে আমরা দেখব আমাদের মন ব্রহ্মাবগাহী হয়েছে, মনের আর অন্যগতি নেই। ব্রহ্মাবগাহী মনের vector সরল পথ ধরে চলে, অন্যগতি রুদ্ধ হয়ে যায়—এ সম্বন্ধে আমার যা মনে হয় তা হচ্ছে দুটি কাছাকাছি ছোট চুম্বকের মাঝখানের ক্ষেত্রের lines of forces খুব curved হয়ে যায়, কিন্তু পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে বিরাট চুম্বক আছে তার lines of forces সমান্তরাল (parallel) দেখায়। curvature প্রায় নেই বললেও চলে। তেমনি আমরা যখন ক্ষুদ্র গণ্ডি, ভোগবাসনার গণ্ডির মধ্যে আছি আমাদের মনের vector খুব দিকপরিবর্তনশীল, জটিল হয় কিন্তু যখন আমাদের মন ব্রহ্মাবগাহী হয়ে যায়, ভগবৎমুখী হয়ে যায়, মনের গতিও সরল সমান্তরাল রেখায় চলে, parallel lines-এ চলে, এদিক ওদিক গতি তখন রুদ্ধ হয়।

চুম্বকের স্পর্শে লোহা চুম্বক হয়ে যায়। একথা বিজ্ঞানের এক প্রমাণিত সত্য। কাজেই ভগবৎনামে ও চিন্তায় ভক্ত যে চুম্বক হবে একথা স্বতঃসিদ্ধ।''

আমরা যদি ভূমায় প্রতিষ্ঠিত হতে চাই তবে আমাদের ভাবনাকে প্রসারিত করতে হবে। ধীরে ধীরে মন ভূমায় অর্থাৎ অসীমে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে তবেই ভূমার আনন্দ লাভ হবে। সব বন্ধন মুক্ত হয়ে যাবে। কাজেই চলার পথে মন যেন প্রসারতার দিকে অগ্রসর হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

—০—

শ্রীসাধনাপুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পৌষ-সংক্রান্তি, ১৩৫৫

যথেষ্ট ঠাণ্ডা থাকা সত্ত্বেও তপোমূর্তি শ্রীঠাকুরের অঙ্গখানি অনাবৃত; গঙ্গামুখী বসেছেন। কিছুক্ষণ পরে কতকগুলি ভক্ত এসে বসলেন। শ্রীঠাকুর তাঁদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসলেন। আশ্রমের স্কুলের দু'জন মাস্টারও এসেছেন, শ্রীঠাকুরের কথা শুনতে। মাস্টারদের সঙ্গে গীতার শ্লোক 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য কথাটী নিয়ে আলোচনা করতে করতে আমাকে ডাকলেন। আমি গেলে, আমাকে বললেন—

শ্রীঠাকুর—হ্যাঁ রে, এই শ্লোকটীর ব্যাখ্যা লেখা আছে?

আমি—হ্যাঁ ঠাকুর, লেখা আছে।

শ্রীঠাকুর—শোনা তো রে। (মাস্টারদের প্রতি) এই মেয়েটি আমার ব্যাখ্যা বা কথা একটু-আধটু লিখে রাখে।

আমি—শুধু আপনার কথা—না, অন্যান্য আচার্যদের ব্যাখ্যাও?

শ্রীঠাকুর—না, সকলেরই পড়।

আমি পড়ে শোনালাম।

১ম মাস্টার ব্যাখ্যা শোনার পর বললেন—এ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা।

শ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, যুগোপযোগী ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আগে ছিল বর্ণাশ্রম অনুসারে ধর্ম—ব্রাহ্মণের কর্ম ধর্ম-অধ্যয়ন, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম যুদ্ধ বা দেশ-শাসন, বৈশ্যের বাণিজ্য-কৃষি, গোরক্ষণ, আর শূদ্রের সেবা; কিন্তু বর্তমানে তো তা নাই। আজকাল লোকে যা পাচ্ছে তাই করছে, যে ব্রাহ্মণের ছেলে হয়তো জুতোর দোকান করছে। আবার অন্য জাতি হয়েও হয়তো আচার্য্যগিরি করছে। আজকাল জুতো-সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব যে যার খুশী করছে। আবার না করলেও যো নেই। সেজন্য 'ধর্ম' মানে আমি একটু ব্যাপক করে নিয়েছি।

আজকাল ধর্মে কিছু limit করলে চলবে না। আজ হয়তো একটা লোক ব্যবসা করছে—আবার কালই হয়তো সে ব্যবসা ছেড়ে পণ্ডিতগিরি করা অধর্ম হচ্ছে। তারপর ধরুন কোন বিশিষ্ট হিন্দুর ছেলে হিন্দুধর্ম ছেড়ে মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ করলে, সেজন্য ধর্ম কথাটা যুগের মত করে ব্যাখ্যা করেছি। চোরের ধর্ম চুরি করতে-করতেই সে এগিয়ে চলেছে। জিন ভল্‌জিনের গল্প পড়েন নি?—চুরি করতে-করতেই তার জীবনের উন্নতি হল।

২য় মাস্টার—না ঠাকুর, পড়িনি।

শ্রীঠাকুর—শুনুন, এটা একটা বিলিতি গল্প। একটা দাগী চোর জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়ে, ঘুরতে ঘুরতে একটী বিশপের কাছে এসে উপস্থিত হল। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় খুব কাতর। বিশপ তাকে খুব আদর-যত্ন করে গভীরভাবে অভিভূত হয়ে চোর কেঁদে ফেলল ও বলল—আমি অভাবে, অনাহারে চুরি করি, আর জেলে যাই। জীবনে কারো সহানুভূতি বা দয়া কোনদিন কিছু পাইনি। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে অভাবে, অনাহারে সংসার প্রতিপালন করতে না পেরে আবার চুরি করি। আবার জেলে যাই। এইভাবে জেলখানার লোকদের অত্যাচারে আমার নাম ভুলে গেছি, আমি এখন ২৯-নম্বরের কয়েদী। আমার নাম নেই। আমি মানুষ নই, আমি শুধু ২৯-নম্বরের কয়েদী—এছাড়া কোনো পরিচয় নেই। এই বলে চোর খুব কেঁদে উঠল। বিশপ তখন তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত করলেন। তখন সে তার জীবনের অভাব, অনাহার আর চুরির কাহিনী বলে গেল। তার খাওয়া হয়ে গেলে, বিশপ তাকে যত্ন করে শোওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু যে চোর তার স্বভাব যাবে কোথায়! গভীর রাত্রে উঠে বিশপের সেই ভাল রূপোর বাতিদানটী চুরি করেছে। এমন সময় বিশপের ঘুম ভেঙ্গে গেল। বিশপ উঠে এসে চোরকে ধমক দিলেন না, মারলেন না, বরং আরো অনেক রূপোর জিনিষ সেই চোরকে দিয়ে বললেন—এই নাও তোমার অভাব ঘোচাও গে—আমি তোমায় দিলাম। চোর তখন বিশপের করুণায় বিগলিত হয়ে, দুটী পায়ে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল; বলল—আমি আর কখনও চুরি করব না—আমি এমন ভালবাসা, এমন ব্যবহার জীবনে কখনও পাইনি—আমি আপনার শরণ নিলাম। তারপর বিশপের কৃপায় সেই চোরের

খুব ভাল চাকরী হল। সে ক্রমে মেয়রের পদ লাভ করল ও বিশপের সৎশিক্ষায় গরীব-দুঃখীর দুঃখ দূর করা জীবনের ব্রত করে ফেলল। এই চোরের নামই হচ্ছে জিন ভল্‌জিন।

এই রকম জিন ভল্‌জিনের মত চুরি করতে-করতেই তাঁর দিকেই এগিয়ে যাবে। তবে সমাজের পক্ষে মুস্‌কিল, সমাজ নিতে পারবে না বটে, তাহলে কি হয়—চোরকে যদি বল, চুরি করো না, তো সে চুরি না করে থাকতে পারবে না। তেমনি চুম্বকের ধর্ম আকর্ষণ করা। জলের ধর্ম শীতলতা—এইসব। যখন ঠাকুরের শরণ নেবে, অহং-এর নাশ হবে তখন ঠাকুর রক্ষা করবেন, সব ভার নেবেন।

১ম মাস্টার—সে কিরকম করে হয়—চোরের ধর্ম চুরি করা, যে যা করে তাই তার ধর্ম—কি করে হবে?

শ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, যে যা করে সেইটাই তার ধর্ম—সে সেই করতে করতে অন্তরে শান্তি পায়। আপনাকে যদি বলি মাস্টারি ছেড়ে যজ্ঞ, তপ এসব করুন—তা আপনি তো পারবেন না—আর আপনার চলবেও না। আর কেউ পারবেও না। ওইজন্য বলি, যে যা কাজ করে, ওইটী তার ধর্ম; তবে কি জানেন, সেটুকু কিন্তু একটু ঈশ্বর-অভিমুখী হয়ে করতে হবে।

২য় মাস্টার—আচ্ছা, শ্রীকৃষ্ণ যে বলেছেন, সব ধর্ম ছেড়ে, আমার শরণ নাও—তাহলে সব ধর্মকার্য্য, সৎকার্য্য, সৎপথ সব ছেড়ে দিয়ে অকর্মা হয়ে বসে থাকতে বলেছেন?

শ্রীঠাকুর—তা কেন? আচ্ছা ধরুন আপনি দিল্লী যাবেন তো—দিল্লী পৌঁছে তবে তো বলবেন আর চলার দরকার নেই—মাঝপথে যদি বলেন যে আমার আর দরকার নাই, তাহলে আপনার আর দিল্লী যাওয়া হয় না—তেমনি গীতার এটী তো শেষদিনের কথা—সারা গীতা বলার পর তবে তিনি বললেন—'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'। ধর্মকর্ম রাখলে তো আর শরণাগত হওয়া যায় না—শরণাগতি হচ্ছে ভক্তিরাজ্যের একেবারে শেষের দিকের কথা। এর জন্য আগে চাই তপস্যা—তপস্যা না থাকলে শরণাগতি হয় না।

১ম মাস্টার—আচ্ছা স্বধর্ম মান ধর্ম একথা চলে—না?

শ্রীঠাকুর—কেন চলে না—যে যা করে তাই তার ধর্ম—অর্থাৎ তার ব্যক্তিত্বকে ধরে রাখে—জগতে উন্নতির পথে এগিয়ে দেয়।

আসলে কি জানেন, ওই যে বললাম—গুণী এবং গুণ phenomena এবং noumena; যখন গুণ গুণীর সঙ্গে এক হয়ে যাবে বা phenomena যখন noumena-র সঙ্গে এক হয়ে যাবে, বা জলের শীতলতা যখন তার সঙ্গে মিলে যাবে, তখনই হবে সম-রস শান্তি। এক কথায়, সর্ব্বধর্ম পরিত্যাগ অর্থে অহং-তত্ত্বের সম্পূর্ণভাবে লয় সাধন করা—অহং-এর অনেকাংশ লয় সাধন করে তাঁর শরণ নিতে পারলে, আর কোন পাপ থাকবে না। গীতার এই বাণীগুলিই হচ্ছে ideal এবং খুব উন্নত অবস্থার সাধকের কথা। ঐগুলি সামনে রেখে সাধককে এগিয়ে যেতে হবে এবং সাধারণ লোকের ক্ষেত্রে ওই যে —যে-কাজই করো না কেন, ভগবৎ-মুখী হয়ে করতে হবে এবং উদ্দেশ্য থাকবে ভগবৎ-লাভ। তাহলে যে-কোন কাজই হয়ে যাবে ধর্ম। ❑

অ(ণ শীল

বাংলা সাহিত্যের শতদল তুমি রূপ-রস আর গন্ধে,
সায়রের বুকে বিকশিত আজও ঘুচাতে মানব দ্বন্দ্বে ।।
তব সঙ্গীত হৃদয় জুড়ায় মনের গভীরে গিয়ে,
তোমার কবিতা প্রেমেরে জাগায় প্রীতির পরশ দিয়ে ।।
ছায়াঘন নীড়ে কোপাই এর তীরে শান্তিরনিকেতনে,
একটু জুড়াতে আজও লোকে আসে সেই তব অঙ্গনে ।।
জীবন যুদ্ধে (ত-বি(ত অর্দ্ধমৃতের দলে,
তব জীবনের নানা ঘটনায় বাঁচার রসদ পেলে ।।
বি(েশ্বর কবি রবি তুমি ওগো জাগাতে মানব প্রাণ,
রচিয়াছ যত মর্মস্পর্শী বিবেক জাগানো গান ।।
রবির নবীন স্নিগ্ধ কিরণে জগ-জনে করে স্নান,
তব রচনায় আছে অমৃত যাহা দেয় মৃতে প্রাণ ।।
কাল জয়ী কবি তুমি ভারতের মহান এক-সন্তান,
প্রণাম তোমায়, পঁচিশে বৈশাখ, রহ উজ্জ্বল, হইও না ম্লান ।।

—০—

শ্রীঅর্চনাপুরীমা

মেঘনা মেঘের মন ছোঁওয়া
আয় বৃষ্টি ঝেঁপে
শাঁওল শাঁওল বরণে
রিম্ ঝিম্ ঝিম্ রণনে
বিজলী হাসি এঁকে।।

ভিজে মাটির সোঁদাল বাস
আয়রে ভরা মেঘের মাস
আউশ ক্ষেতের বাঁকেতে
যে পথ গিয়েছে বেঁকে।।

তোকে কুর্চি ফুলের মালা দেব
যুঁই মল্লীর বালা দেব।

মানিক বনের ঐ আড়ে
বাজিয়ে বাঁশী মল্লারে
বাদল দিনের পথিকে দিস
একটু যদি ডেকে।।

—০—

✡ বিশ্বাস হয়ে গেলেই হল। বিশ্বাসের চেয়ে আর জিনিস নাই। বিশ্বাস আর ভক্তি। তাঁকে ভক্তিতে সহজে পাওয়া যায়। —শ্রীরামকৃষ্ণদেব

✡ সাধন বলো, ভজন বলো, অর্থোপার্জন বলো, তীর্থ দর্শন বলো—সব প্রথম বয়সে করে নিতে হয়। বৃদ্ধ বয়সে কফ শ্লেষ্মায় ভরা শরীরে সামর্থ্য থাকে না, মনে বল থাকে না, তখন কি কোনও কাজ হয় ?
—শ্রীমা সারদাদেবী

শ্রীশরণাপুরী

আমি একজনকে খুঁজছি
বলতে পারো সে কোথায় থাকে ?
তুমি আগে বল সে কেমন দেখতে?
কি করে?
কতদিন আগে তাকে দেখছ?
তবে তো খোঁজাখুজি করবো ?
সে আমায় বড্ড ভালবাসতো
সবার সাথে সে আমার পরিচয়
করিয়ে দিয়েছিল।
চিরদিনের মত আমাকে স্মরণীয় করে
তুলেছিল
আলোতে বাতাসে
হাসিতে বাঁশীতে
সে আমার কত গুণ গাইতো—
বল না সে কোথায় থাকে?
আহা কাঁদছ কেন
আচ্ছা বল তো তার উপজীব্য কি ছিল?
তুমি তাও জানো না
সে যে মস্তবড় কবি ছিল—
তা তার নামটা কি ছিল
নাম বললে আমাকে কাঁদাবার জন্য
তাকে বকবে না তো ?
কি মুস্কিল
তবে তোমার নামটাই বল ?
আমার নাম শিপ্রা
সেই যে উজ্জয়িনীর শিপ্রা গো

—০—

ওঠ, জাগো—সৎ ও পবিত্র হও, এগিয়ে পড়। সব সময় Auto Suggestion করবে মনকে, বলবে তোমার দ্বারা কোন হেয় কাজ হতে পারে না, সেই 'উদ্ধরেদাত্মনা', আত্মার দ্বারা আত্মার উদ্ধার করবে। সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে কারণ সাধারণ মন একটা আদর্শে লেগে থাকতে পারে না, থিতিয়ে পড়ে।
—শ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেব

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবেরভাবাদর্শের আলোকে বিভিন্ন মতবাদের সমন্বয়মূলক
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ও আধুনিক যুগসম্মত বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দদেব

চতুর্থোহধ্যায়ঃ

জ্ঞানযোগঃ

পুরুষোত্তমতত্ত্ব সমস্ত সৃষ্টির মধ্যমণিস্বরূপে বিদ্যমান, তাঁকে জানলে আর কোন মোহমায়ার বন্ধন থাকে না। প্রথমে সমস্ত বিশ্বচরাচর ভূতবর্গকে নিজ নিজ আত্মায় একীভূত করে, অর্থাৎ সকলকে ঠিক নিজের মত প্রীতিতে দেখলে এই একত্বানুভূতি আর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায়। 'অহং ব্রহ্মাস্মি, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই বোধ লাভের পর সেই জ্ঞান দ্বারা আবার এই সমস্ত বিশ্বচরাচর ভূতবর্গকে এবং নিজেকে আবার পুরুষোত্তম বা ইষ্টের মধ্যে অনুভব করলে তখন আর মোহের বন্ধন থাকে না। এটি ব্রহ্মজ্ঞান লাভেরও পরের কথা।

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥৩৬

চেৎ (যদি) সর্ব্বেভ্যঃ (সমস্ত অপরাধীগণ হতেও) পাপকৃত্তমঃ অপি (পাপিষ্ঠ হও), (তথাপি) সর্ব্বং বৃজিনং (সমস্ত পাপ সমুদ্র) জ্ঞানপ্লবেন এব (জ্ঞানরূপ নৌকা দ্বারাই সন্তরিষ্যসি (উত্তীর্ণ হবে)।

তুমি যদি সমস্ত পাপী হতেও বেশী পাপাচারী হও, তথাপি জ্ঞানরূপ নৌকা দ্বারা বিশাল পাপসমুদ্র উত্তীর্ণ হতে পারবে ॥৩৬

সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি– বিজ্ঞানে বলে জলের ঊর্ধ্বচাপের ফলে জলের ওপরে বস্তুকে ভাসিয়ে রাখে, অবশ্য যদি সেই বস্তুর ওজন সেই পরিমাণ জলের ঊর্ধ্বচাপের চেয়ে বেশী না হয়। জ্ঞানের তো ওজন নেই–কাজেই জ্ঞান সব সময়ই হালকা, সেজন্য জ্ঞানরূপ তরণী সব সময়েই পাপরূপ সমুদ্রে সহজেই ভেসে যায়।

জ্ঞানকে পোতের সঙ্গে তুলনা করার আর একটি দিক আছে–পোতের নিজ শক্তিতে সমুদ্রে ভেসে যাবার ক্ষমতা আছে তেমনি জ্ঞানের পথেও পুরুষকারের প্রয়োজন, ভক্তিরাজ্যে অবশ্য ভগবানের কৃপাই প্রধান। 'সন্তরিষ্যসি' অর্থাৎ সম্যক্-রূপে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে বা ভেসে যাবে এর মধ্যে আর কোন সন্দেহ নেই।

যথৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥৩৭

(হে) অর্জ্জুন! যথা (যেমন) সমিদ্ধঃ অগ্নিঃ (জ্বলন্ত অগ্নি) এধাংসি (কাষ্ঠসমূহকে) ভস্মসাৎ কুরুতে (ভস্মীভূত করে), তথা জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্ব কর্ম্মাণি (তেমনি জ্ঞানাগ্নি কর্ম্মবন্ধনগুলিকে) ভস্মসাৎ কুরুতে (ভস্মীভূত করে)।

হে অর্জ্জুন! যেমন জ্বলন্ত অগ্নি কাষ্ঠসমূহকে ভস্মীভূত করে, তেমনি জ্ঞানরূপ অগ্নি কর্মবন্ধন বা কর্ম্মফল-রাশিকে ভস্মসাৎ করে ॥৩৭

যথৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতে–জ্ঞানাগ্নি কিরূপে কর্ম্ম-রাশিকে ভস্ম করে এটি একটি বোঝবার জিনিষ। বাসনা-কামনা থেকেই মানুষের কর্ম্মপ্রেরণা আসে। জ্ঞান এই কামনা-বাসনা ইত্যাদিকে ধ্বংস করে দেয়–ব্রহ্মানুভূতি বা পুরুষোত্তম লাভ হলে সর্ব্বকর্ম্মবন্ধনের অবসানও হয়। এটিকেই ভগবান 'ভস্মসাৎ' অর্থে ব্যবহার করেছেন।

বিজ্ঞানে বলে 'Ignition point-এর পূর্বে আগুনের কোন flame দেখা যায় না। এই point-এ উঠলে আগুনের flame দেখা যায়, কাজেই এই point-এর উপরে যত heat বাড়বে তত অগ্নিও প্রজ্বলিত হবে এবং তখনই আসবে সব কিছু দগ্ধ করে ভস্ম করার কথা। এখন এই ignition point বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন রকমের। Paraffin-এর একরকম, কাঠের একরকম, বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন রকমের। এবং এগুলির দগ্ধীভূত হলে রূপান্তরিত হয়, অর্থাৎ এমন পদার্থে পরিণত হয় যে, তার পর আর কোন পরিবর্তন করা যায় না। এ বস্তুপিণ্ড তখন পূর্ব্বের সমস্ত আকৃতি, অবয়ব ও স্থূলত্ব হারিয়ে ফেলে নূতন পদার্থ হয়। গীতামতেও তাই যখন ভগবৎলাভ হবে তখন কর্ম দগ্ধীভূত হলে রূপান্তরিত হয়, অর্থাৎ এমন পদার্থে পরিণত হয় যে, তার পর আর কোন পরিবর্তন করা যায় না। এ বস্তুপিণ্ড তখন পূর্ব্বের সমস্ত আকৃতি, অবয়ব ও স্থূলত্ব হারিয়ে ফেলে নূতন পদার্থ হয়। গীতামতেও তাই যখন

ভগবৎলাভ হবে তখন কর্ম্ম দগ্ধীভূত হবে। অর্থাৎ তখন আর বন্ধনের কারণ হবে না, গীতামতে যন্ত্রবৎ হওয়াই সেই অবস্থা। এই অবস্থায় কেবল যন্ত্রবৎ হওয়া—নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্' একাদশ অধ্যায়ের ৩৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য। এখন এই ignition point বা প্রজ্বলনের জন্য চাই তপস্যা বা অত্যধিক তাপমাত্রা। জ্ঞান তাই তপস্যার অপেক্ষা রাখে, যা মনকে তপ্ত অবস্থায় আনীত করে কর্ম সকলকে ভস্মে পরিণত করে।

জ্ঞানাগ্নি আমাদের সমস্ত কর্ম ভস্ম করে, মন তখন সমতা-প্রাপ্ত হয় বা স্বরূপতা-প্রাপ্ত হয়, বৈষম্য চলে যায়। এই জ্ঞানপন্থীদের মতে, আর ভক্তিমতে জীব তখন নিত্য কৃষ্ণদাস হয়ে যায় আর গীতামতে 'বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্ম্য সুদুর্লভঃ'

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।

তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥৩৮

ইহ (এই পৃথিবীতে) জ্ঞানের সদৃশং (জ্ঞানের মত) পবিত্রং ন হি বিদ্যতে (পবিত্র আর কিছুই নাই); তৎ (সেই জ্ঞান) যোগসংসিদ্ধঃ (কর্মযোগানুষ্ঠানে সিদ্ধ সাধক) কালেন (কালক্রমে) আত্মনি স্বয়ং বিন্দতি (স্বয়ং অন্তঃকরণে সেই জ্ঞান লাভ করেন)।

এই জগতের জ্ঞানের ন্যায় শুদ্ধ পবিত্র আর কিছু নাই। কর্মযোগে সিদ্ধ সাধক সেই জ্ঞান কালে আপনিই লাভ করে থাকেন ॥৩৮

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে—গীতামতে 'জ্ঞান' অর্থে পুরুষোত্তম জ্ঞান। ভগবৎতত্ত্ব বা পুরুষোত্তমতত্ত্ব যখন সর্বাপেক্ষা পবিত্রতম তখন তাঁর জ্ঞানও সর্বাপেক্ষা পবিত্রতম।

তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ—এখন এই যে 'স্বয়ং' কথা এইটির মধ্যে এসে যায় কৃপাবাদ—সত্যিকারের ভগবৎকৃপা ভিন্ন তো আর ভগবৎ-জ্ঞান লাভ হয় না, তাই 'স্বয়ং' বলেছেন। জ্ঞানলাভের জন্য, মানুষের সাধনার প্রয়োজন সত্য, কিন্তু রেশিও (ratio) কষলে দেখা যাবে ভগবৎ-লাভ বা আত্মজ্ঞান লাভের তুলনায় সে চেষ্টা খুব ক্ষুদ্র, তাই কর্ম্মযোগ সহায়ে ভগবানের সঙ্গে নিত্য যুক্ত হবার চেষ্টা করতে করতে সেই জ্ঞান কৃপা করে তিনিই দেন।

কালেনাত্মনি বিন্দতি --কর্ম্মযোগী, রাজযোগী, জ্ঞানযোগী বা ভক্ত যেই হোক নিজের নিজের পথে ঠিক ঠিক ভাবে চললে ঠাকুর সব জিনিষই দিয়ে থাকেন। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর বলতেন, 'তাঁকে লাভের পর জ্ঞানের অভাব থাকে না। তিনিই রাশ ঠেলে দেন।' গীতায় ভগবান জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্ম চারটির সমুচ্চয় সাধন করেছেন, আবার কখনও জ্ঞানের প্রাধান্য, কখনও ভক্তির প্রাধান্য, কখনও কর্মের প্রাধান্য, কখনও বা যোগের প্রাধান্য দিয়েছেন; যেমন মানুষের কখনও thinking, কখনও feeling কখনও বা willing-এর প্রাধান্য ঘটে থাকে, গীতাতেও আমরা সেই রকম দেখতে পাই, এই অধ্যায়টি মূলতঃ জ্ঞানযোগ, সেজন্য এখানে জ্ঞানের প্রাধান্য দিয়েছেন, 'নহি জ্ঞানেন সদৃশং'।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।

জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥৩৯

শ্রদ্ধাবান্ (আস্তিক্য বুদ্ধিযুক্ত পুরুষ) তৎপরঃ (অনলস, একনিষ্ঠ) সংযতেন্দ্রিয়ঃ (জিতেন্দ্রিয় পুরুষ) জ্ঞানং লভতে (জ্ঞান লাভ করেন); জ্ঞানং লব্ধ্বা (জ্ঞান লাভের পর) অচিরেণ (শীঘ্রই) পরাং শান্তিং (পরম শান্তি) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন)।

যিনি শ্রদ্ধাবান্, ঈশ্বরে একনিষ্ঠ এবং জিতেন্দ্রিয় তিনিই জ্ঞান লাভ করেন। জ্ঞান লাভের ফলে শীঘ্রই পরা শান্তি লাভ করেন ॥৩৯

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং—'শ্রদ্ধা' শব্দের অর্থ আস্তিক্য-বুদ্ধি। ভগবৎ-অস্তিত্ব সম্বন্ধে যিনি বিশ্বাসবান— তিনিই শ্রদ্ধাবান। সমস্ত হিন্দুদর্শন বা হিন্দুধর্মেই এক বিরাট চৈতন্যসত্তা স্বীকৃত হয়েছে। কালী, দুর্গা, কৃষ্ণ, শিব, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ইত্যাদি যে ধর্মে বা উপাস্য সেই নামেই তিনিই অভিহিত হয়েছেন। ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনে ও যেমন এক বিরাট চৈতন্যসত্তা স্বীকৃত, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেও তেমনি দেখি cosmic energy স্বীকৃত হয়েছে এবং সেই cosmic energy কেই আমরা বলবো ভগবৎ শক্তি। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে বলে ২টী Hydrogen molecule মিলে একটি Helium molecule সৃষ্টি হয়, এই Helium molecule-এ পরিণত হতে গিয়ে যে অংশটি বেশী থেকে যাচ্ছে সেইটি light, heat ইত্যাদি শক্তিতে বা energy তে পরিণত হচ্ছে এবং এইভাবে বিশ্বের অনেক

matter উপযুক্ত অবস্থায় energy সৃষ্টি করছে। সর্বব্যাপ্ত নিত্যসৃষ্টি এই energy সম্ভবতঃ cosmic energy।

'শ্রদ্ধা' অর্থাৎ আস্তিক্য-বুদ্ধি–এখানে গীতায় ভগবান বলেছেন–'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্'–অর্থাৎ জ্ঞানলাভের জন্য চাই শ্রদ্ধা--পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানে এবং তর্কবিদ্যা-(Logic)-তেও আমরা দেখি Knowledge is ordinarily defined as a system of ideas corresponding with a system of things outside, and involving a belief in that correspondence. কাজেই দেখা যাচ্ছে জ্ঞানার্জনের পথে বৌদ্ধিক বিচার, প্রত্যক্ষ অনুভূতি, verification অর্থাৎ যাচাই করা ইত্যাদি ছাড়াও বিশ্বাস হচ্ছে একটি বিশেষ দিক–'All Knowledge is belief, though all belief is not knowledge'. কাজেই গীতায় ভগবানের এই কথার সঙ্গে পাশ্চাত্য দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের মিল রয়েছে–কেন না সেখানেও Uniformity, Identity, Contradiction ইত্যাদিতে বিশ্বাস করতেই হয়।

'শ্রদ্ধা' অর্থে, তিনি আছেন বিশ্বাস; 'শ্রদ্ধধদেব মনুতে' ছান্দোগ্য উঃ–৭।১৯।১ ।। তাঁতে বিশ্বাস আগে না হলে কিছুই দাঁড়ায় না। বৈষ্ণব শাস্ত্রে তাই বলা হয়েছে 'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর'। আর পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানে বলে–'belief বলতে চিন্তার cognitive side, অর্থাৎ চিন্তার জ্ঞানের দিকের ওপর জোর দেওয়া হয়, আর faith বলতে ক্রিয়ার ওপর, conative side–ইচ্ছার দিকের ওপর জোর দেওয়া হয় (J. Ward. P. 358)।

তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ–তৎপরঃ–(ত্রি) আসক্ত। ইত্যমরঃ ।। তৎপরায়ণঃ (তৎ + পর + অয়ন) যথা –শুদ্ধা ভবন্তি যদ্যন্যেহন্ত্যজ্যঃ কৃষ্ণপরায়ণাঃ। পদ্মোত্তর খণ্ডে ।। গীতা ভক্তিশাস্ত্র, অতএব এখানে 'তৎপর' অর্থাৎ যিনি ভগবৎ বিষয়ে, ইষ্ট বিষয়ে বা পুরুষোত্তমতত্ত্বে একনিষ্ঠ বা আসক্ত তিনিই তৎপর। জ্ঞান লাভ করতে হলে শুধু শ্রদ্ধাবান হলেই চলবে না, আদৌ শ্রদ্ধা প্রয়োজন, অর্থাৎ আস্তিক্য-বুদ্ধি প্রয়োজন, তারপর চাই দেহমনের প্রস্তুতি। তৎপর হওয়ায় মনের প্রস্তুতি, আর সংযতেন্দ্রিয় শব্দে দৈহিক ও মানসিক দুয়ের প্রস্তুতিই বললেন।

অভাববোধ ও কামনা বাসনা ইত্যাদিই সমস্ত অশান্তির কারণ। কিন্তু মন যখন ইষ্ট চিন্তায় তন্ময় হয়ে ভগবৎলাভে একীভূত বা অভিভূত হয়ে যায় তখন তো সব অশান্তি মন থেকে চলে যায়–মন তখন অপার্থিব শান্তিতে ভরে যায়।

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকেহস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ।। ৪০

অজ্ঞঃ অশ্রদ্দধানঃ (আস্তিক্য-বুদ্ধিহীন) সংশয়াত্মা (অবিশ্বাসী চিত্ত) বিনশ্যতি বিনশ্যতি (বিনাশপ্রাপ্ত হয়); সংশয়াত্মাঃ (সন্দেহচিত্ত ব্যক্তির) অয়ং লোকঃ (এই লোক) ন অস্তি (নেই), ন পরঃ (পরলোকও নেই) ন সুখং (সুখও নেই)।

যে অজ্ঞ, আর ঈশ্বর ও শাস্ত্রাদিতে অবিশ্বাসী ও সংশয়াচ্ছন্ন ব্যক্তি তার বিনাশ নিশ্চিত। সংশয়াত্মার এই লোকেও শান্তি নেই, পরলোকেও শান্তি নেই, কাজেই সুখও নেই ।। ৪০

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ–যারা শাস্ত্রোপদেশ, গুরুর উপদেশ ও সৎবাক্য শুনেও গ্রহণ করে না এবং ভগবৎতত্ত্বে যাদের বিশ্বাস নেই তারা অশ্রদ্ধা-যুক্ত, আর অজ্ঞ অর্থাৎ যারা জানে না। অজ্ঞ আর অশ্রদ্ধাযুক্ত এ দুটির মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে একটি positive ignorance আর একটি হচ্ছে negative ignorance। অজ্ঞতা ইচ্ছাকৃত নয়–তার মধ্যে জানার অভাব, তাই negative ignorance ; কিন্তু অজ্ঞতাও অপরাধ, বিরাট বিশ্বের স্রষ্টা ভগবানকে না জানাও বিশেষ অপরাধ। দেশের যে সমস্ত আইন সেগুলি কেউ যদি না জেনে ভঙ্গ করে তাহলেও আইন অনুসারে তার সাজা হয়–ঠিক তেমনি গীতামুখে ভগবান বলেছেন–জেনে হোক, না জেনে হোক, ভগবৎসত্তাকে অশ্রদ্ধা করলে বিনাশ ঘটবে।

সংশয়াত্মা বিনশ্যতি–'বিনাশ' অর্থে কিন্তু এখানে আধ্যাত্মিক উন্নতির বিনাশ।

নায়ং লোকোহস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ– পাশ্চাত্য দর্শনে Doubt সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলা আছে–Doubt একমাত্র জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকরী–Doubt as the condition of knowledge and of its growth. The dictum of Hamilton, 'We doubt in order that we may believe'. Balfouer says. 'No philosophy or theory of knowledge can be satisfactory which does not find room within it for the quite obvious but not sufficiently considered

fact that so far as empirical science can tell us anything about the matter, most of the proximate causes of belief and all its ultimate causes are non-rational in their character'. কিন্তু Philosophy-কে স্থান দেয় না—doubt কে তারা অজ্ঞানেরই নামান্তর বলে। Morality, religion এসব ক্ষেত্রে doubt একেবারে বর্জনীয়। নৈতিক দর্শনে ও ধর্মে doubt বা সংশয়কে perverseness, waywardness, or even sin and dwelt বা সংশয়কে perverseness, waywardness, or even sin and dwelt with by disapproval, censure, condemnation, excommunication, punishment or execution বলা হয়েছে। প্রোটেস্টান্ট ক্যাথলিক এছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মে সংশয়ের স্থান নেই। 'Truth cannot change, what is once truth is always truth, once certitude always certitude'.

সংশয়ের বিশেষ ক্ষতিকারক দিক—The danger of doubting is not only that is may become a fixed habit, but that interest I & V centre in the process itself as severed from the complex of normal mental activities and healthy enthusiasm and becomes a manla (doubtion madness ; folie du ; doubt ; Grubel sucht). Pathologists have accepted this as a special type of insanity. Its symptoms are a state of persistent intellectual unrest, a devouring metaphysical hunger, a morbid anxiety for mental satisfaction, accompanied not infrequently by a Hamlet-like paralysis of the will.

তাহলেই দেখা যাচ্ছে জ্ঞানের অগ্রগতির পথে doubt একটা সোপান মাত্র, কিন্তু যখন সেই truth একবার established truth এ পরিণত হবে তখন সেখানে doubt-এর আর স্থান নেই। তাও এই জ্ঞান জাগতিক জ্ঞান, আর পারমার্থিক জ্ঞানের পথে চাই আদৌ শ্রদ্ধা, অর্থাৎ আস্তিক্য-বুদ্ধি—গুরু, ইষ্ট, শাস্ত্র সদাচার এ সমস্ত ক্ষেত্রে একবার মন স্থির করলে আর সন্দেহের স্থান নেই। গুরুকরণের আগে দিনে রাত্রে সব সময় সাধু বা মহাপুরুষকে বাজিয়ে যাচিয়ে নিতে পারা যায়, কিন্তু গুরুকরণের পর ধর্মরাজ্যে আর সংশয় আনলে যথেষ্ট ক্ষতির সম্ভাবনা। ঐ সমস্ত বিভিন্ন কারণের জন্য গীতায় ভগবান বলেছেন, 'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি'-কেননা গীতা মূলতঃ ভক্তিশাস্ত্র, কাজেই এখানে সংশয়ের স্থান নেই। ধর্মরাজ্যে, জ্ঞানের রাজ্যে, দর্শনের রাজ্যে, বিজ্ঞানের রাজ্যে সর্বক্ষেত্রেই সংশয়ের প্রয়োজন আছে সত্য বস্তু জানার জন্য, কিন্তু তার উদ্দেশ্য হবে সংশয় নিরসন করে জ্ঞানলাভ করা—আর যে সংশয় শুধু স্বভাবগত—নিরসনের কোন চেষ্টা যেখানে নেই সেখানেই আসে বিনাশ।

পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানে বলা হয়েছে, 'There is the feeling of relief in belief, for it puts an end to the state of doubt or suspense, which makes us uneasy'. কাজেই যাদের কোন কিছুতেই বিশ্বাস নেই, সর্বত্রই সংশয়, তাদের সুখও থাকে না।

'সুখং' কথাটি খুব সত্য—ভগবৎতত্ত্বে যাঁরা শ্রদ্ধাশীল—ভগবানকে যাঁরা আপনজন করে নিয়েছেন, বুকের আকুতি দিয়ে ভালবেসে, তাঁদের জীবনে শান্তি, সুখ, নিশ্চিত ভাব সবই থাকে এবং সাধারণের থেকে বেশীই থাকে। অজ্ঞেয়বাদী বা অবিশ্বাসী রাসেল, তিনিও বলেছেন, 'ভগবান আছেন কিনা জানি না, কিন্তু এটুকু জানি যে যাঁরা ভগবানকে মানেন তাঁরা সুখী—তাঁরা শান্তি পান, এইজন্যে যে তাঁদের কাঁদবার জায়গা আছে—দুঃখে বিপদে শোকে তাপে ভগবদ্বিশ্বাসীর একটা প্রার্থনা জানাবার জায়গা আছে, কিন্তু রাসেল প্রমুখ অজ্ঞেয়বাদীদের তা নেই। যতক্ষণ পাউণ্ড-শিলিং-পেন্স আছে যতক্ষণ খাওয়া পরা ইত্যাদি, কিন্তু তা বলে পাউণ্ড-শিলিং-পেন্সের কাছে কাঁদার কোন অর্থ হয় না। আর তাঁদের বিবাহবন্ধনও ক্ষণস্থায়ী কাজেই স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদির সঙ্গেও সম্বন্ধের কোন স্থিরতা নেই। কাজেই ভগবৎ-বিশ্বাসীদের আর কিছু না হোক কাঁদবার জায়গা আছে। সেহেতু দেখা যাচ্ছে যে মানসিক সুখ বা শান্তি ভগবানকে ডাকলে পাওয়া যায়। এখন রাসেলের যে কথা ভগবানকে না জেনে শান্তি, কেঁদে শান্তি পাবার কথা, এটি subjective শান্তির কথা কিন্তু সত্যিকারের যখন ভগবানকে জানতে চাইবো বা লাভ করবো তখন তো শান্তিলাভ আরও নিশ্চিত, তিনি যে শান্তিদাতা—শান্তিস্বরূপ। কাজেই তাঁকে লাভ করলে শান্তি তো তিনিই দেবেন। (ক্রমশঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

শুনুন তা হলে, ঘটনাটা বলি। নারদ এসেছেন, যেমন আসেন আকাশপথে। স্বর্গে, মর্ত্যে তাঁর অবাধ গতিবিধি। নারদ এসেছেন বিশাল নগরীতে (উজ্জয়িনী)। সেখানে প্রায়ই ধর্মকথা হয়। অতি পুণ্যস্থান। ভূ-স্বর্গও বলা চলে। নারদমুনির সঙ্গে হঠাৎ চারজন ঋষির দেখা। এঁরা হলেন সনৎকুমার, 'সনকাদিকুমারগণ'। কুমারগণ নারদকে অতি বিমর্ষ ও চিন্তিত দেখে প্রশ্ন করলেন, 'ঋষিবর এত দ্রুতগতিতে আপনি কোথায় চলেছেন, কোথা থেকেই বা আসছেন? এত চিন্তিতই বা কেন?'

নারদ বললেন, 'কুমারগণ! আমি চিরকালই নির্লিপ্ত। কোনও কিছুই আমাকে বিচলিত করতে পারে না। আমি এই পৃথিবীকে মনে করি সর্বোৎকৃষ্ট লোক। এখানে পুষ্কর, প্রয়াগ, কাশী, গোদাবরী (নাসিক), হরিদ্বার, কুরুক্ষেত্র, শ্রীরঙ্গ, সেতুবন্ধ, রামেশ্বর, কত কত তীর্থ! সবই আমি ঘুরে ঘুরে দেখলুম; কিন্তু এ কী হল এবার? কোথাও কেন শান্তি পেলুম না। সর্বত্র কলি---কলি লেগে গেছে পৃথিবীতে। ধর্মকে ঠেলে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে অধর্ম, অনাচার। সত্য, তপস্যা, শৌচ (অন্তরে, বাহিরে পবিত্রতা), দয়া ও দান আদি কিছুই কেন। দীন জীবগণ কেবল নিজের উদরপূরণে রত, অসত্যভাষী, নিষ্প্রভ, আলস্যপরায়ণ, মন্দবুদ্ধি, ভাগ্যহীন, উপদ্রবগ্রস্ত। যারা সাধু বলে পরিচিত, তারা পাষণ্ডকর্মকারী। দেখলে মনে হবে সংসার-উদাসীন, অনাসক্ত, বিরক্ত, কিন্তু নারী ও বিত্তে বিলক্ষণ আসক্ত। গৃহে গৃহে স্ত্রীদের প্রাধান্য, শ্যালকরাই পরামর্শদাতা। লোভবশতঃ মানুষ কন্যা বিক্রয় করছে, প্রতি গৃহেই দাম্পত্য কলহ। মহাত্মাদের আশ্রম, তীর্থ, পুণ্য নদী বিধর্মীদের অধিকারে চলে গেছে। বহু দেবালয় নষ্ট করে দিয়েছে।'

সনৎকুমারদের কাছে নারদ তাঁর ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন, 'এই একটা সময়!' সেই সব যোগী ও সিদ্ধপুরুষরা কোথায় অদৃশ্য হলেন! না আছে কোনও জ্ঞানী, কোনও সৎকর্মকারী পুরুষ! সমস্ত সাধনই আজ কলিরূপ দাবানলে ভস্মীভূত।

'এই কলিযুগে প্রায় সকলেই বাজারে অন্ন বিক্রয় করছে, ব্রাহ্মণরা অর্থের বিনিময়ে বেদের অধ্যাপনা করছে, প্রায় সকল স্ত্রীরাই বেশ্যাবৃত্তিতে রত', নারদের এই ক্ষোভ দেবভাষায় আরও বলিষ্ঠ :

ন যোগী নৈব সিদ্ধো বা ন জ্ঞানী সৎক্রিয়ো নরঃ।
কলিদাবানলেনাদ্য সাধনং ভস্মতাংগতম্।।
তট্টশূলা জনপদাঃ শিবশূলা দ্বিজাতয়ঃ।
কামিন্যঃ কেশশূলিন্যঃ সম্ভবন্তি কলাবিহ।।

নারদ বলছেন, 'তারপর? তারপর আমি সেই যমুনাতীরে উপস্থিত হলাম—যেখানে শ্রীভগবান কৃষ্ণচন্দ্র বহু লীলা করেছিলেন। সেই পুণ্যস্থান এখন অতি বিষণ্ণ এক শূন্যস্থান। শুষ্ক বাতাস, উত্তপ্ত ধুলো, শীর্ণ যমুনা। কোথায় পাখির কলতান! গোপবালাদের কলকণ্ঠ! সবই যেন মৃতপ্রায়। সেই যমুনার তীরে, আমি এক অত্যাশ্চর্য দৃশ্য দেখলাম—এক যুবতী স্ত্রী মাথা নিচু করে বসে আছেন। বিষণ্ণ বদন। পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ যেন তাঁর ওপর ভেঙে পড়েছে। তাঁর পাশে দুই বৃদ্ধ পুরুষ অচেতন অবস্থায় পড়ে আছেন। জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছেন। মৃত্যু বুঝি আসন্ন। ওই রমণী মাঝে মাঝে তাঁদের সেবা করছেন। চৈতন্য ফিরিয়ে আনার উতলা চেষ্টা। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সেই বালিকা উঠে দাঁড়াল ও ব্যাকুল হয়ে বলতে লাগল, 'হে মহাত্মন্! ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমার চিন্তা দূর করুন। আপনার দর্শন তো মানুষের সকল পাপ সর্বথা হরণ করে। আমার কী ভাগ্য যে এই দুঃসময়ে আপনার দর্শন পেলাম!'

নারদ বললেন, 'আমি সেই স্ত্রীকে প্রশ্ন করলাম, দেবী! তুমি কে? এই দু'জন পুরুষই বা কে? আর হঠাৎ দেখছি আরও অনেক স্ত্রী কোথা থেকে এসে তোমাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছেন, এঁরাই বা কে?'

সেই বালিকা বললে, 'আমার নাম ভক্তি, আর অচৈতন্য এই দুই বৃদ্ধ, আমার দুই পুত্র—জ্ঞান ও বৈরাগ্য। কালের ফেরে এঁদের এই অবস্থা হয়েছে। আর এই দেবীরা সব গঙ্গাদি নদীসমূহ। এরা সকলেই আমার সেবার জন্যে এখানে এসেছে; কিন্তু এদের সেবাতেও আমার সুখ-শান্তি হচ্ছে না।'

নারদ ঋষিকুমারগণকে বলছেন, 'আমার কাহিনী শেষ হয়নি। ধৈর্য ধরে আরও একটু শুনুন। কালের প্রভাবে ভক্তির কী করুণ অবস্থা! ভক্তিদেবী বললেন, 'আমি দ্রাবিড় দেশে

উৎপন্না হয়ে কর্ণাটকে বর্ধিত হয়েছি। মহারাষ্ট্রে কোনও কোনও স্থানে আমি সম্মানিত হলেও গুজরাতে আমি বৃদ্ধা হয়ে পড়ি। সেখানে ঘোর কলিযুগের প্রভাবে পাষণ্ডরা আমার অঙ্গসকল ভেঙে দেয়। বহুকাল এই অবস্থায় থাকার ফলে দুই পুত্র আর আমি নিস্তেজ হয়ে পড়ি। তখন আমরা অতি কষ্টে বৃন্দাবনে আসি! বৃন্দাবনে আসার পর আমি আবার পরমাসুন্দরী রূপবতী নবযুবতী হলেও আমার পুত্র দুটির কোনও পরিবর্তন হল না। আমি বড়ই কাতর, আমার পুত্র দুটির জন্য উদ্বিগ্ন অতিশয়। আমি এই স্থান পরিত্যাগ করে চলে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত। হে বুদ্ধিমান যোগসাগর। আমাকে এই অদ্ভুত কাণ্ডের কী কারণ, অনুগ্রহ করে বলুন---মাতা যুবতী, সুন্দরী, পুত্র দুটি অকালবৃদ্ধ। বিপরীতটাই হওয়া উচিত ছিল, মাতা বৃদ্ধা, পুত্র দুটি তরুণ।'

নারদঋষি বললেন, 'দেবী! সাবধানে শোনো, এখন দারুণ কলিযুগ। জপ-তপ, সদাচার, যাগ-যজ্ঞ লুপ্ত হয়েছে। মানুষের মনে শঠতা, দুষ্কর্ম করার প্রবৃত্তি। সব মানুষই যেন এক-একটি অঘাসুর। জগতের যেদিকেই তাকাবে, দেখবে, সৎপুরুষ দুঃখে ম্লান, দুষ্টরা মহানন্দে দিনাতিপাত করছে। দেবী!

শৃণুস্বাবহিতা বালে যুগোহয়ং দারুণঃ কলিঃ।
তেন লুপ্তঃসদাচারো যোগমার্গস্তপাংসি চ।।
জনা অঘাসুরায়ন্তে শাঠ্যদুষ্কর্মকারিণঃ।
ইহ সন্তো বিষীদন্তি প্রহৃষ্যন্তি হাসাধবঃ।।

দেবি! তথাপি, উদ্ধারের, নিজেকে রক্ষা করার একটি পথ এই কালেও মুক্ত আছে; 'ধত্তে ধৈর্যয়ং তু যো ধীমান্ স ধীরঃ পণ্ডিতোহথবা।' যে বুদ্ধিমান এই 'কাল' সময়ে ধৈর্যধারণ করে, শ্রীভগবানের ওপর সমস্ত অর্পণ করে নির্ভয়ে জীবনযাপন করবেন, তিনিই ধীর, তিনিই পণ্ডিত।

'এই পৃথিবী অনন্ত কালের প্রবাহে, পাপের ভারে ক্রমশ ভারী হয়ে আরও ভারী হচ্ছে। এত পাপ ধারণ করেছে যে, স্পর্শেরও অযোগ্য। চোখে দেখতেও ইচ্ছে করে না। এখানে জীবের মঙ্গলের কোনও আশা আছে বলে মনে হয় না। দেবি! তুমি ভক্তি! একালে কোনও মানুষের মনে ভক্তি আছে কি? পুত্র কি পিতাকে ভক্তি করে? সন্তান কি তার গর্ভধারিণী মাতাকে ভক্তি করে? দেবতার প্রতি মানুষের প্রকৃত ভক্তি গেল কোথায়? আন্তরিক ভক্তি? সকলেই তো বিষয়ে মত্ত, অন্ধ। আর তোমার দুই সন্তান, জ্ঞান ও বৈরাগ্য। এই ঘোর তামস অন্ধযুগে কে চায় জ্ঞান? কার মনে জাগে বৈরাগ্য? বিষয় বিষে সব জর্জরিত। এদের গ্রাহক এইকালে কোথায়? এ যে কলিকাল। ভক্তির সঙ্গে জ্ঞান, জ্ঞানের উন্মেষে বৈরাগ্য—এই সংযোগ কি সম্ভব?'

ভক্তি বললেন,'ঋষিবর আমার একটি প্রশ্নের উত্তর আপনি আমাকে দিন, রাজা পরীক্ষিৎ, তিনি বীর, তিনি মহান, তিনি আমাদের বল, বীর্য, ভরসা, কেন তিনি ওই পাপী কলিকে প্রবেশের অধিকার দিলেন? কেন তাকে স্থান দিলেন? সমূলে বিনাশ করলেন না? কলিযুগ আসামাত্রই সকল বস্তুর মহান সারাংশ কোথায় চলে গেল! শ্রীহরি সবই তো দেখছেন, জানেন; তিনিও কেন উদাস!'

নারদ বললেন, 'বালিকে! শান্ত হও। আমি তোমাকে কারণ বলছি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেদিন এই ভূলোক ত্যাগ করলেন, সেই দিনই এখানে কলিযুগের সূচনা। কলি এসে হাজির। নিঃশব্দে, সবার অলক্ষ্যে।'

হে রাজন! আমারও তো এই একই অভিযোগ, সেই ভয়ংকর রাহুসম চরিত্রটিকে হাতের কাছে পেয়েও তার অপকর্ম প্রত্যক্ষ করেও আপনি তাকে ছেড়ে দিলেন, জগতের বুকে খেলা করার অধিকার দিলেন, কেন মহারাজ! আপনার দিকে কেন অভিযোগের আঙুল তুলে দাঁড়িয়ে আছে মহাকাল? কেন আপনি জীবজগৎকে ফেলে রেখে গেলেন কয়েক লক্ষ বছরের ঘূর্ণিপাকে?'

সেদিন আপনি কী দেখেছিলেন? অবাক সেই দৃশ্য! ভাগবতপাঠের আসরে পাঠক আজও পাঠ করেন 'পয়ার' ছন্দে সেদিনের সেই কথা। সরস্বতী নদীর তীরে যা ঘটেছিল:

সরস্বতী তীরে আসি নৃপতি তখন।
অপরূপ দৃশ্য এক করিল দর্শন।।
নরপতি বেশধারী শূদ্র একজন।
দণ্ডহাতে গোমিথুনে করিছে তাড়ন।।

একটি বৃষ আর একটি গাভী। সেই বিকট দর্শন রাজবেশধারী মানুষটি নির্মমভাবে বৃষটিকে প্রহার করছে; নির্জন সরস্বতী-নদীতটে। সরস্বতী স্বর্গের নদী মর্ত্যেও প্রবাহিত, অধুনা অদৃশ্য। বৃষটির কী অপূর্ব রূপ!

'শ্বেতশুভ্রবর্ণ আর মৃণালের সম।' শূদ্রের প্রহারে সেই বৃষ অসহায়। আরও আশ্চর্য, বৃষটির একটি পা, অপর তিনটি পা নেই। 'দীনভাবে এক পদে দাঁড়ায় সেখানে।/ঘনঘন কাঁপে বৃষ অতি ভয় প্রাণে।' গাভীটির শরীর কৃশ। কত দিনের অনাহারে তার এই অবস্থা—দীনাহীনা কৃশা! গাভীটি তৃণের সন্ধানে যাওয়ার চেষ্টা করতেই সেই লোকটির উপর্যুপরি নির্মম পদাঘাত। অতি করুণ, বেদনাদায়ক সেই দৃশ্য আপনি আপনার রথে বসে দেখছেন। গাভীটির দু'চোখ বেয়ে জল ঝরছে।

আজই তোর শেষ দিন! তবে তার আগে আমার জানা দরকার, এই বৃষটি কে! 'তুমি কে মহাপ্রাণ? মৃণালশুভ্র দেহ। কদাচারী, পশুসম, রাজবেশধারী, কদাকার ওই মানুষটির নির্মম প্রহারে তুমি ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত, ভীত—তুমি কে?'

পাণ্ডবশাসিত, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা একদা সুরক্ষিত এই রাজ্যে দুষ্কৃতকারী পামরদের কোনও স্থান নেই। হ্যাঁ—এ কথা ঠিক—ধর্ম আর রাজধর্মে কিছু পার্থক্য আছে। পৃথিবীতে স্বাভাবিক কালে অর্থাৎ যখন কোনও বিপদ থাকে না, তখন কিন্তু বিপথগামী, অধার্মিক প্রজাদের প্রতিপালনও রাজধর্ম হিসাবে, রাজার কর্তব্য হিসাবে নির্দেশিত। সেই অঙ্গীকার আমি দায়বদ্ধ। এই যে বলা হচ্ছে ঃ

রাজ্ঞো হি পরমো ধর্মঃ স্বধর্মস্থানুপালনম্।
শাসতোহন্যান্ যথাশাস্ত্রমনাপদ্যুৎপথানিহ।।

বিপথগামী, অধার্মিক ব্যক্তিদেরও নিজ নিজ ধর্ম, বর্ণ, আশ্রম অনুসারে পালন করাই প্রজাশাসক রাজার শ্রেষ্ঠ ধর্ম! কিন্তু, এই নৃশংসতা, আমি সহ্য করতে পারব না। হে অলৌকিক, একপদবিশিষ্ট, মৃণালশুভ্র বৃষ! এটি আপনার ছদ্মরূপ, আসলে আপনি কে?

'আমি? যুগ যুগ ধরে আমার যে পরিচয় তা হয়তো সহজে এককথায় প্রকাশ করা যাবে না। আমি প্রশ্ন দিয়ে প্রশ্নের উত্তর দেব—কে সেই পুরুষ? কোথায় বসে তিনি জীবের যত দুঃখ অক্লেশে, অকাতরে সৃষ্টি করে চলেছেন? তবে শুনুন এই স্বগতোক্তি :

ন বয়ং ক্লেশবীজানি যতঃ স্মঃ পুরুষর্ষভ।
পুরুষং তং বিজানিমো বাক্যভেদবিমোহিতাঃ।।

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজন, আমরা বিভিন্ন পণ্ডিতের মতবাদে বিভ্রান্ত। ভিন্ন, ভিন্ন মতবাদ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোথা থেকে কার দ্বারাই বা জীবগণের দুঃখ সৃষ্টি হচ্ছে, সেই পুরুষের সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না।

মহারাজ! পণ্ডিতদের মধ্যে যাঁরা অভেদ, অদ্বৈতবাদী তাঁরা বললেন, আত্মাই আত্মার সুখ বা দুঃখের কারণ। যাঁরা দেবতার বিশ্বাসী, তাঁরা বলবেন, দৈবই জীবের সুখ-দুঃখের কারণ। যাঁরা কর্মে বিশ্বাসী, অর্থাৎ মীমাংসক, তাঁরা বলবেন কর্মফল; আর যাঁরা নাস্তিক, তাঁরা বলবেন, জীবের স্বভাব, জীবের প্রকৃতি তার দুঃখ-সুখের কারণ। মহারাজ! আমি তা হলে এই বলতে চাইছি—জীবের সুখ ও দুঃখ বাক্য মনের অগোচর, পরমেশ্বরেরই বিধান। এখন আপনিই বিচার করুন, আমার এই দুঃখ ও নিগ্রহের কারণ।'

রাজা পরীক্ষিৎ কিছুকাল নীরব থেকে, তারপর বললেন, 'চিনেছি আপনাকে—আপনি স্বয়ং ধর্ম। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে আপনি পৃথিবীতে বিচরণ করেন। এখন আপনার বৃষ রূপ। আপনি প্রাজ্ঞ তাই সাবধানি। দোষী, অপরাধী যারা, তারা তো নরকে যাবে, সেই সঙ্গে যারা তাদের সন্দেহবশে চিহ্নিত করে, তারাও নরকে যায়। সুতরাং অপরাধীর নাম উল্লেখ না করে আপনিই ঠিক করেছেন। ভগবানের অলৌকিক মায়াশক্তির প্রভাবে আমাদের বোধগম্য নয়। তিনি কী করবেন, কী করবেন না, তা তিনিই জানেন? হে ধর্ম! সত্যযুগে তপস্যা-শৌচ-দয়া ও সত্য এই চারটি সম্পূর্ণভাবে আপনার শরীর সংলগ্ন ছিল; কিন্তু ক্রমশ অধর্মের সহায়ক অহংকার, পরনারীসঙ্গ, মদ্যপান ইত্যাদি পাপাচারের সংস্পর্শে আসায় আপনার চরণগুলির মধ্যে তিনটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। মানুষের নীচতা, মত্ততার মাশুল আপনাকেই দিতে হয়েছে। এই ক্ষয়রোধের ক্ষমতা আপনার একার হাতে তো নেই। অন্যের আচরণে ধর্মের শরীর গঠিত, তা আমি জানি; যেমন সমুদ্র থেকে উত্থিত জলস্তম্ভ জল দিয়ে গঠিত। হে ধর্ম ইদানীংকালে তোমার 'সত্য' নামক চরণটি অবশিষ্ট থাকায় তুমি কোনও প্রকারে তোমার অস্তিত্ব রক্ষা করছ; কিন্তু 'কলি' নামক কাল অচিরে ওটিকেও গ্রাস করবে। তা আমি জানি। (ক্রমশঃ)

কথামৃতের খণ্ডচিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ পূজা

অধ্যাপক অরিজিৎ সরকার

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক আর্নল্ড টয়েনবির ভাষায়---''Religion is not just a matter for study, it is something that has to be experienced and to be lived, and this is the field in which Sri Ramakrishna manifested his uniqueness.'' কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের তাই প্রথম দর্শনের প্রতিক্রিয়া---''আহা কি সুন্দর স্থান! কি সুন্দর মানুষ! কি সুন্দর কথা! এখান থেকে নড়তে ইচ্ছা করছে না।'' শ্রীরামকৃষ্ণ সুন্দর মানুষ। আমরা সবাই সুন্দরকে চাই। সৌন্দর্যের পূজারী আমরা। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী আরও সুন্দর। যত দিন এগোচ্ছে কথামৃতের আঘ্রাণ মানুষকে তৃপ্ত শুধু নয়, পরিতৃপ্ত করছে। করবেও ভবিষ্যতে। আগামী প্রজন্ম কথামৃত ছাড়া বাঁচতে পারবে না। যুগ সঙ্কটের SOS হল কথামৃত। ডাক্তার যেমন রোগীকে তার প্রয়োজনীয় ঔষধ SOS করে লিখে দেন, শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত আমাদের মানবসভ্যতার SOS। তাই শ্রী-ম তিথি নক্ষত্র দিয়ে, তারিখ উল্লেখ করে শ্রীরামকৃষ্ণ সকাশের কথাবার্তা লিখে রাখতেন। বলতেন—'নিজের মঙ্গলের জন্য প্রথমে লিখতে আরম্ভ করি, যাতে তাঁর উপদেশ আরো ভালো করে জীবনে পরিণত করতে পারি।' আসলে শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত থেকে কি পাই আমরা তার হিসাব নিকাশ চলে না। ভাবপ্রবণ সংবেদনশীল মন নিয়ে যদি আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত অনুধ্যান করি তাহলে কিছুটা flashback memory-র মত খণ্ডচিত্র মনের ক্যানভাসে বিবর্তিত হয়। এবারের এই লেখা সেই খণ্ডচিত্রসমূহেরই সমাহার।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনাবসানের পর তিনি অর্থাৎ শ্রী-ম তাঁর ডায়েরীর রত্নাগার থেকে ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে 'Gospel of Sri Ramakrishna' নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশ করলেন। শ্রীশ্রীমা বাংলার ২১শে আষাঢ়, ১৩০৪ বঙ্গাব্দে একটি পত্র লিখলেন—''বাবাজীবন, তাঁহার নিকট যাহা শুনিয়াছিলে সেই কথাই সত্য। ইহাতে তোমার কোন ভয় নাই। এক সময় তিনিই তোমার কাছে ঐ সকল কথা রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে আবশ্যকমত তিনিই প্রকাশ করাইতেছেন। এই সকল কথা ব্যক্ত না করিলে লোকের চৈতন্য হইবে না জানিবে।''

মানুষের চৈতন্যের জাগরণের জন্যই এবার তাঁর আবির্ভাব। এই আবির্ভাবে বর্জন নেই, আছে শুধু গ্রহণ। আছে ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, সংযম ও সত্য। তাই তো ঠাকুর অসুখেও একটাই চিন্তা করেছিলেন যে কিসে ভক্তদের মঙ্গল হয়। শ্রী-ম এই খনি আবিষ্কার করে মানবসমাজকে উপহার দিয়েছিলেন। এই আবিষ্কার যথার্থই 'ক্লাসিক' ঘটনা।

কথামৃতে কি পাই বা না পাই—তার মূল্যায়ণ করা যাবে না। কারণ—অনন্ত সাগরের তলাতল পাওয়া দুরূহ। শুধু মননে কিছু কথার নৈবেদ্য সাজালাম।

ঘরের দেওয়ালে ছবি রাখা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের উদ্দেশে বলছেন—''সকালবেলা উঠে অন্য মুখ না দেখে সাধু-সন্ন্যাসীদের মুখ দেখা ভাল। ইংরাজী ছবি দেওয়ালে—ধনী, রাজা, কুইনে-র ছবি—কুইনের ছেলের ছবি, সাহেব-মেম বেড়াচ্ছে তার ছবি রাখা— এসব রজোগুণে হয়।''

কথামৃত কেবল মাত্র ধর্মীয় সাহিত্য নয়, তা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেও বিভিন্ন ভূমিকার দাবী রাখে। কেশবসেনকে তাই ঠাকুর সুন্দর করে বলেছেন—''যে ব্যক্তি 'আমি বদ্ধ' 'আমি বদ্ধ' বারবার বলে, সে শালা বদ্ধই হয়ে যায়। যে রাতদিন 'আমি পাপী' 'আমি পাপী' এই করে সে তাই হয়ে যায়।'' একবার এক ব্রাহ্মভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''ঈশ্বর সাকার না নিরাকার?'' শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, ''তাঁর ইতি করা যায় না। তিনি সাকার আবার নিরাকার। ভক্তের জন্য তিনি সাকার। যারা জ্ঞানী অর্থাৎ জগৎকে যাদের স্বপ্নবৎ মনে হয়েছে, তাদের পক্ষে তিনি নিরাকার।'' ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে সেপ্টেম্বর শ্রীরামকৃষ্ণ কলকাতা নগরীতে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি শিবনাথ শাস্ত্রী

মহাশয়ের বাড়ীতে যাবেন। কয়েকজন ভক্ত উপস্থিত হলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী বাড়ীতে না থাকায় উপস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষেরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে অভ্যর্থনা করে সমাজমন্দিরে নিয়ে গেলেন। ঠাকুর তখন ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি উপদেশ দিয়ে আমাদের মত মানুষের চেতনার দরজায় আঘাত দিলেন। ধর্ম সকলের। ঠাকুর বললেন— "শুনলাম, এখানে নাকি সাইনবোর্ড আছে। অন্যমতের লোক নাকি এখানে আসবার জো নাই।" ভগবানের কাছে No Entry সাইনবোর্ড চলে না। আমাদের জন্য ঠাকুর সর্বদাই আছেন, থাকবেনও।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে আমরা খুঁজে পাই গ্রামীণ সমাজ জীবনের চালচিত্র। তীব্র বৈরাগ্য না এলে ঈশ্বরদর্শন হয় না—একথা কম বেশি আমরা সকলেই জানি। কিন্তু ভক্তের এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব উত্তর দিলেন একটি গ্রাম্য উপমায়। বললেন—"মাছ ধরে শটকা কল দিয়ে। বাঁশ সোজা থাকবার কথা; তবে নোয়ানো রয়েছে কেন? মাছ ধরবে বলে। বাসনা মাছ তাই মন সংসারে নোয়ানো আছে। বাসনা না থাকলে মনের সহজ ঊর্দ্ধদৃষ্টি হয়। ঈশ্বরের দিকে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ রসরাজ। কথামৃতে সেই বর্ণনাই মেলে। তিনি নিজেও যেমন হাসতেন, শ্রোতাদেরও তেমন হাসাতেন। বলতেন—'দেখ বিজয়, সাধুর সঙ্গে যদি পুঁটুলি থাকে, পনেরটা গাঁটওয়ালা যদি কাপড়-বুচকি থাকে তাহলে তাদের বিশ্বাস করো না। আমি বটতলায় ওই রকম সাধু দেখেছিলাম। দু-তিনজন বসে আছে, কেউ ডাল বাছছে, কেউ কেউ কাপড় সেলাই করছে আর বড় মানুষের ভাণ্ডারার গল্প করছে।' সেই ঠাকুরই মোহনভোগ দেখে নরেনের প্রতি বলেছিলেন—'ওরে মাল এসেছে! মাল! মাল! খা! খা!' ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারও এই হাস্যরসে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি একদিন মজার ঘটনা শোনালেন—"পাড়ার বাবুদের বাড়ীতে সাতমাসের মেয়ের অসুখ করেছিল—ঘুঙরী কাশি। আমি দেখতে গিছিলাম। কিছুতেই অসুখের কারণ ঠিক করতে পারি নাই। শেষে জানতে পারলুম, গাধা ভিজেছিল, যে গাধার দুধ সেই মেয়েটি খেত।" ঠাকুরও সঙ্গে সঙ্গে বললেন--- 'কি বলে গো! তেঁতুলতলায় আমার গাড়ি গিছিল, তাই আমার অম্বল হয়েছে।'

কথামৃতের এই সব খণ্ডচিত্র বলে শেষ করা যাবে না কখনই। শুধু একটি কথা বিশেষ করে মনে পড়ছে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এযুগে এসেছিলেন বিশেষ এক যুগ প্রয়োজনে। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের কাছেই তিনি পৌঁছে দিতে চেয়েছেন ধর্মের বাণী। তিনি বলেছেন একটি কথা—'ঈশ্বরের কাছে গেলে তিনি কখনও তোমার জাত জানতে চাইবেন না। জানতে চাইবেন, তুমি তাঁর জন্য কি করেছো।' নানকের এই কথা আমাদের সকলের জন্যই প্রযোজ্য। জীবনের এই স্বল্প অভিজ্ঞতায়, ক্ষুদ্র চলায় এইটুকুই বুঝতে চেয়েছি যে তাঁর জন্য কিছু করা দরকার। এই ক্ষুদ্র লেখনী সেই সাধু কথার পুনরুচ্চারণ। এরই মাধ্যমে আমরা স্নাত হব। ঠাকুরকে পূজা করব। তা থেকেই পবিত্রতা জাত হবে। আমরা অমৃতময় হয়ে উঠব। তাই ধন্য শ্রী-ম। আমরাও ধন্য। শ্রী-ম কথিত শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের চিত্রায়ণে এই পূজা রূপ অর্ঘ্য দিতে পেরে। মনে রাখতে হবে কথামৃত কিন্তু আসলে 'শ্রী-ম' -কথিত স্বয়ং ঠাকুরই শ্রী। তাই সেই সুধায় আমরাও যেন চৈতন্যময় হয়ে উঠতে পারি। গিরিশ ঘোষের মতন বলতে পারি—"মহাশয়, কি বলব! আপনাকে চিন্তা করে আমি কি ছিলাম কি হয়েছি! আগে আলস্য ছিল, এখন সে আলস্য ঈশ্বরে নির্ভর হয়ে দাঁড়িয়েছে! পাপ ছিল, তাই এখন নিরহংকার হয়েছি! আর কি বলব!" সত্যি বলার তো কিছুই নেই। তাঁর অন্ত নেই যে গো! শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যিই সুন্দর, সৌম্য ও পবিত্রময় স্রষ্টা। ধর্ম দান করার চৈতন্যময় আলোকজ্জ্বল এক সত্তা—ছুঁলেই সোনা।

—০—

জীবন তরু একদিনে সুন্দর হয়ে ওঠে না। ধীরে ধীরে সে বড় হয়। তোমরাও তেমনি ধীরে ধীরে ফুলের মত ফুটে ওঠ, সুন্দর হও, শান্ত সংযত হও, ঠাকুরের হাতে যন্ত্র হও। —স্বামী সত্যানন্দদেব

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রামানুজ গোস্বামী

দ্বিতীয় অধ্যায়

যে কথাটি এবার না বললেই নয়, তা হল এই যে, ভক্তি পথে চলতে হলে আমাদের কিছু কিছু বিষয় মেনে চলতে হবে। এগুলি হল একপ্রকার বিধি-নিষেধ যা আমাদের অবশ্যই পালন করতে হবে। এক্ষেত্রেও আমরা নারদীয় ভক্তিসূত্রের কয়েকটি সূত্র নিয়ে আলোচনা করব। নারদীয় ভক্তিসূত্রে বলা হয়েছে যে—

"স্ত্রী-ধন-নাস্তিক-(বৈরি)-চরিত্রং ন শ্রবণীয়ম্' ।৬৩।

অর্থাৎ---"নারী, ধনসম্পত্তি, নাস্তিক ব্যক্তি বা শত্রুসম্বন্ধীয় কোন আলোচনা শোনা উচিত নয়।" আবার পরবর্তী সূত্রেই বলা হয়েছে যে,

"অভিমানদম্ভাদিকং ত্যাজ্যম্" ।৬৪।।

অর্থাৎ—"অহঙ্কার, দম্ভ প্রভৃতি হীন মনোভাব ত্যাগ করা কর্তব্য।"

—এক্ষেত্রে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, আমাদের সেই সমস্ত কিছুই পরিত্যাগ করতে হবে যা আমাদের চিত্ত-চাঞ্চল্যের কারণ হতে পারে। এক্ষেত্রে, এমন কিছু বিষয় (যেমন–কামিনী ও কাঞ্চন ইত্যাদি) যেগুলি আমাদের ভক্তির হানি ঘটাতে পারে, সেগুলির থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে। এই বিষয়ে অহঙ্কারাদি নানা রিপুর প্রভাবের কথাও তো এসেই পড়ে। অতি দর্পী রাবণের পরিণতির কথাও তো আমাদের সকলেরই জানা। তাই যে কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরই রিপুর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকবার জন্য প্রতিনিয়তই চেষ্টা করা কর্তব্য। সাধকদের ক্ষেত্রে তো অতি অবশ্যই এই সকল বিষয়ে সদা-সর্বদাই লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ, সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে ধর্মাচরণ আর পাঁচটা কাজের মতোই একটা কাজ; কিন্তু সাধকদের ক্ষেত্রে তো তা নয়—সাধক সাধনা করেন সিদ্ধিলাভের জন্য আর সামান্য চিত্তচাঞ্চল্যও সেই সাধকের সাধনার ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। বহু সাধকের সাধনাই এই রকম বহু সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতির কারণে ব্যর্থ হয়েছে। তাই সিদ্ধ হতে হলে বা সিদ্ধপুরুষ হতে চাইলে এই সকল নিয়ম অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গেই পালন করা কর্তব্য। ভক্তিযোগে ভক্তির হানি ঘটাতে পারে এমন সমস্ত কিছুকেই তাই পরিত্যাগ করাই কর্তব্য।

এই সকল বাধা-বিপত্তি যদি সাধন-জীবন থেকে দূর করা সম্ভব হয়, তবেই সাধক ভগবানের কৃপায় পরাভক্তি লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। কেবল মাত্র তখনই সে ভগবানের একান্ত ভক্ত হতে পারে। দেবর্ষি নারদ এই শ্রেণীর ভক্তদের 'প্রধান' বা 'প্রথম শ্রেণীর ভক্ত' বলে অভিহিত করেছেন। এই সকল ভক্তেরা নিজেদের শুধুমাত্র একটি কর্মেই নিয়োজিত করে রাখেন। তা হল ভগবানের সেবা। ভগবান ব্যতীত ভক্তের কাছে সমস্ত কিছুই মূল্যহীন ও বৃথা। এই শ্রেণীর ভক্তেরা সর্বদাই কেবল নিজেদের ইষ্টের চিন্তায় রত থাকেন। নানা রকম সাত্ত্বিক ভাবও তাই এই সকল সাধকের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। যেমন—অশ্রু বিসর্জন, ভগবানের নাম শ্রবণে পুলকিত হওয়া ইত্যাদি। সকল সিদ্ধ মহাপুরুষদের জীবনেই এই সকল ঘটনা লক্ষ্য করা যায়। বলাই বাহুল্য যে, যে সকল সাধকের ক্ষেত্রে এই সকল সাত্ত্বিক লক্ষণ তথা ভাব প্রকাশিত হয়, নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে, তিনি সাধনার ক্ষেত্রে বহু দূরে অগ্রসর হয়েছেন ও ঈশ্বরের অতি নিকটে পৌঁছে গিয়েছেন।

এক্ষেত্রে যে কথাটি না বললেই নয় তা হল, যে কোনও সাধনাতেই সিদ্ধিলাভ নির্ভর করে সাধকের সাধনার তীব্রতা ও ঈশ্বরের প্রতি সেই সাধকের ব্যাকুলতার উপরে। বস্তুতঃ চিত্তকে যদি একমাত্র ভগবানের প্রতিই নিবিষ্ট করা যায় অর্থাৎ সর্বাবস্থায় ভগবান ব্যতীত যদি অন্য কোন বিষয়ে মন ধাবিত না হয়, তবেই বলা যেতে পারে যে, সেই সাধক ভগবানের ঐকান্তিক ভক্ত হয়ে উঠতে পেরেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল যে, এইরকম উচ্চ অবস্থা কিরূপে লাভ করা সম্ভব?

এক্ষেত্রে, উত্তর একটিই; ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সহযোগে এবং অতি অবশ্যই সদিচ্ছাসহ ঈশ্বরের কাছে ঐকান্তিক প্রার্থনা করতে থাকলে, ভগবান সেই প্রার্থনা অবশ্যই পূর্ণ করেন। ভক্তিপথের পথিক বা সাধকদের ভক্তিগ্রন্থ সকল অতি অবশ্যই পাঠ করা উচিত। বৃথা বাক্য-ব্যয় বা তর্ক-বিতর্কে সময়ের অপচয় না করাই উচিত। কারণ, এতে সাধকের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে যা সাধনায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে। তাই ভক্ত বা সাধকের সেই সব কিছুকেই একমাত্র নিজের মনে ঠাঁই দেওয়া উচিত যা ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত। কারণ, সেই সাধককেই ভগবান

দর্শন দেন যে নিজের সবটুকু ভগবানকে দিতে বা সমর্পণ করতে পেরেছে। সাধারণভাবে ভক্তকে কিছু নিয়ম পালন তো করতেই হয়। প্রকৃতপক্ষে এই নিয়মগুলি শুধুমাত্র ভক্তিপথের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এমনটা কিন্তু নয়—বরং যে কোনও সাধনমার্গের ক্ষেত্রেই এগুলি প্রযোজ্য। নানা রকম সদ্‌গুণাবলী যেমন, সত্যবাদীতা, অহিংসা, দয়া ইত্যাদির অনুশীলন করা সাধকের একান্ত কর্তব্য। কিভাবে ভক্তিযোগে সাধকের সিদ্ধিলাভ ঘটে, সেই বিষয়ে নারদীয় ভক্তিসূত্রে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সাধক একমাত্র ভগবানের ভজনা বা সাধনা করেই সমস্ত সময় ব্যয় করবেন। এটিই হবে সাধকের এক ও একমাত্র কাজ। এই ভাবে যদি কোনও ভক্ত একনিষ্ঠ ভাবে নিরন্তর ভগবানের স্তব-স্তুতি ও কীর্তন করতে পারে, তবে অতি শীঘ্রই সেই ভক্তের সামনে আবির্ভূত হন স্বয়ং ঈশ্বর। এই শ্রেণীর ভক্তেরাই শুদ্ধ ভক্ত বা উত্তম শ্রেণীর ভক্ত বলে পরিচিত।

এই প্রকারের সিদ্ধ ভক্তেরা যে স্থানে অবস্থান করেন, সেই স্থানই হয়ে ওঠে তীর্থস্বরূপ। অন্যদিকে এই সকল মহাপুরুষের সংস্পর্শে এসে বা এই সকল সিদ্ধ ব্যক্তিদের উপদেশ শ্রবণ করে মানুষ ধন্য হয়, ভগবানের ভক্তে পরিণত হয়। তাই, একথা বলতে পারাই যায় যে, ভক্তিযোগে সিদ্ধ ভক্তেরা সাধারণ মানুষের হৃদয়ে ভক্তির ঐশ্বরিক চেতনার জাগরণ ঘটিয়ে থাকেন। জগতের ইতিহাসে এমন বহু মহাপুরুষের কথা তো আমরা জানি—এই সকল মহাপুরুষের সান্নিধ্যে এসে কত অগণিত মানুষ জীবনে সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছে, ঈশ্বরপথের পথিক হতে পেরেছে। এই সকল ভক্তেরা ভগবানের একান্ত কাছের জন আর তাই এই সকল ব্যক্তি ভগবানের অতি প্রিয়। আমাদেরও তাই পরম কর্তব্য হল শাস্ত্র ও এই সকল মহাপুরুষের দ্বারা নির্দিষ্ট ভক্তিযোগের পথ অবলম্বন করে জীবনে পথ চলা; এর ফলে আমাদের জীবন হবে ভক্তি ভাবে পরিপূর্ণ ও ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য এই বিষয়ে আমরা স্বামী বিবেকানন্দের কিছু বক্তব্য নিয়ে পর্যালোচনা করব। স্বামীজী বলেছেন যে, ‟যখন প্রেমের এই উচ্চতম আদর্শে উপনীত হওয়া যায়, তখন দর্শনশাস্ত্র ফেলিয়া দিতে হয়, কে আর তখন ঐগুলির জন্য ব্যস্ত হইবে?...... ভক্ত বলেন, ‘চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি।’.... প্রেমের জন্য প্রেম-ইহাই ভক্তের সর্বোচ্চ সুখ।.... আমি একজনকে জানি, লোকে তাঁহাকে পাগল বলিত। তিনি উত্তর দিতেন, ‘বন্ধুগণ, সমুদয় জগৎ তো একটা বাতুলালয়। কেহ সাংসারিক প্রেম লইয়া উন্মত্ত, কেহ নামের জন্য, কেহ যশের জন্য, কেহ অর্থের জন্য, আবার কেহ বা স্বর্গলাভের জন্য পাগল। এই বিরাট বাতুলালয়ে আমিও পাগল। আমি ভগবানের জন্য পাগল। তুমি টাকার জন্য পাগল, আমি ঈশ্বরের জন্য পাগল। তুমিও পাগল, আমিও পাগল। আমার বোধ হয়, শেষ পর্যন্ত আমার পাগলামিই সবচেয়ে ভাল।’ প্রকৃত ভক্তের প্রেম এই প্রকার তীব্র উন্মত্ততা, উহার কাছে আর সব আকর্ষণই অন্তর্হিত হয়। সমুদয় জগৎ তাঁহার নিকট কেবল প্রেমে পূর্ণ—প্রেমিকের চক্ষে এইরূপই বোধ হয়। যখন মানুষের অন্তরে এই প্রেম প্রবেশ করে, তখন তিনি অনন্তকালের জন্য সুখী, অনন্তকালের জন্য মুক্ত হইয়া যান। ভগবৎ-প্রেমের এই পবিত্র উন্মত্ততাই কেবল আমাদের অন্তরস্থ সংসার-ব্যাধি অনন্তকালের জন্য আরোগ্য করিতে পারে।

প্রেমের ধর্মে আমাদিগকে দ্বৈতভাব আরম্ভ করিতে হয়। ভগবান আমাদের পক্ষে আমাদের হইতে ভিন্ন, আর আমরাও তাঁহা হইতে আমাদিগকে ভিন্ন বোধ করি। প্রেম উহাদের মধ্যে আসিয়া উভয়ের মিলন সম্পাদন করে। তখন মানুষ ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। আর ভগবানও মানুষের ক্রমশ অধিকতর নিকটবর্তী হইতে থাকেন। মানুষ সংসারের সব সম্বন্ধ— যেমন পিতা, মাতা, পুত্র, সখা, প্রভু, প্রণয়ী প্রভৃতি ভাব লইয়া তাঁহার প্রেমের আদর্শ ভগবানের প্রতি আরোপ করিতে থাকেন। তাঁহার নিকট ভগবান এই সর্বরূপে বিরাজিত। আর তিনি তখনই উন্নতির চরম সীমায় উপস্থিত হন, যখন তিনি নিজ উপাস্য দেবতাতে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হইয়া যান।..... মানুষ স্বয়ং এই প্রেমজ্যোতির সম্মুখে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া যান।”

বস্তুতঃ এটিই হল ভক্তের সঙ্গে ভগবানের সত্যকার সম্পর্ক। প্রেম বা ভক্তি যা কিছুই বলা হোক না কেন, সেটিই ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে সেতু সৃষ্টি করে। একসময় ভক্ত ভগবানের সঙ্গে একত্ববোধ অনুভব করে। এটিই হল প্রেমের সার্থকতা। ভক্তি পথে কিভাবে পথ চললে ঈশ্বরের দর্শন পাওয়া যায়, সেই বিষয়ে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করব। (ক্রমশঃ)

জীবন যখন পথ খোঁজে

সমীর ভট্টাচার্য্য

আমাদের সাধারণ মানুষের জীবনে এটা একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়, যখন দেখা যায় যে পথে এগোলাম সেটা ভুল এবং প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় এখন কোন পথে এগোব। বিশেষ করে ঈশ্বরের দয়া ও তার কৃপালাভ করার জন্য যখন প্রাণ কাঁদে, তখন এই প্রশ্নটাই বড় হয়ে দেখা দেয়। এমন সময় আসে যখন দেখি অশান্তিতে জীবন জর্জরিত হচ্ছে, বুঝি সুখের জন্য সংসারের যে পথে ছুটে চলেছি, তা শুধু কঠিন নয়, দুঃখেরও, তখন বুঝি আমার দ্বারা নির্বাচিত পথ ভুল ছিল। সেই সময় এদিক ওদিক ছুটে মরি ঈশ্বরের কৃপা লাভের জন্য, যদি তিনি দয়া করেন, যদি তিনি এই অন্ধকার থেকে আমাদের উদ্ধার করেন। ঈশ্বর সব সময় অসীম ভালোবাসা নিয়ে বিপথ থেকে সঠিক পথে ফেরাতে চেষ্টা করেন, কিন্তু আমরাই এগিয়ে যাই না, আমরাই বুঝি না তিনি এমনই দয়াময়। আমাদের ভুল বোঝার ভারে ভারাক্রান্ত মন তা বুঝতে চায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার বলেছেন—"আমরা এক পা এগোলে তিনি দশ পা এগিয়ে আসেন।" কথাগুলি আমরা শুনি, কিন্তু বুঝি না কারণ মনকে আমরা সেভাবে তৈরী করতে পারি নি। তাই বিশ্বাস আমাদের কখনই দৃঢ় হয় না। বুঝি না এই সন্দেহে ভরা মন ও অবিশ্বাসই আমাদের প্রধান অন্তরায়, সেটাই আমাদের মনকে শক্ত বেড়াজালে আটকে রেখেছে। তার সান্নিধ্যে আসতে দেয় না। ভগবান মন দেখেন, তিনি দয়ার ও ভালবাসার সাগর, তিনি তা উজাড় করে দিতে চান, কিন্তু পারেন না কারণ আমাদের অবিশ্বাসের বেড়াই তখন বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে ঈশ্বরে বিশ্বাস যদি দৃঢ় থাকে, যদি কোন অশুভ শক্তি তাকে নড়াতে না পারে, ঈশ্বর সেই ভক্তকে তার ভালোবাসা দিয়ে আগলে রাখেন। এই প্রসঙ্গে একটি সত্যি ঘটনা বলি, যা পৃথিবীর ইতিহাসে আজও এক উজ্জ্বল জীবন কাহিনী হয়ে রয়ে গেছে।

অ্যাটোলুই (Auto Lui) অষ্ট্রিয়াতে ইউনিভার্সিটি অফ অষ্ট্রিয়াতে পড়াতেন ও গবেষণাও করতেন। তার জীবনের দুটি দিক ছিল, একদিকে বিজ্ঞানচর্চা, অন্যদিকে আধ্যাত্মিকতা। বিশ্ববিদ্যালয়ের তার বৈজ্ঞানিক বন্ধুরা তার সঙ্গে মিশতে চাইতেন না তার এই ধরণের জীবনের জন্য। বিশেষ করে তার ঈশ্বর ভক্তি, যেটা নিয়ে তারা ঠাট্টা করতেন। বৈজ্ঞানিক সমাজে স্থান দিতে চাইতেন না। অ্যাটোলুই তাই একা হয়ে জীবন কাটাতেন। তার বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ে বক্তৃতা দেওয়ার সময় যখন তিনি তার নতুন আবিষ্কারের কথা বলতেন। অন্যসব বৈজ্ঞানিকরা তা হেঁসেই উড়িয়ে দিতেন। একযোগে চিৎকার করে স্টেজ থেকে নেমে আসতে বলতেন। তাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করাটাই তাদের অভ্যেস ছিল। এইসব অন্যায় ও অশান্তিকে উনি দূরে ঠেলে দিতে পারতেন তাঁর দৃঢ় ঈশ্বর বিশ্বাসের জন্য।

কিন্তু এই আবিষ্কারটির মৌলিকতা ও মূল্য অসীম ছিল। উনিই প্রথম যিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে মস্তিষ্ক থেকে যে স্নায়ুগুলি আমাদের সবরকম শারীরবৃত্তীয় কাজগুলিকে চালনা করে সেটা শুধুমাত্র ইলেকট্রিক জাতীয় বার্তা দিয়ে নয়। যেটা যন্ত্রে দেখা যায়। তিনি বলতেন স্নায়ু থেকে এক ধরণের রাসায়নিক রসের মত বস্তু নিঃসৃত হয়ে বাইরে আসে আর মস্তিষ্কের বার্তাবহনের কাজ করে। তার এই আবিষ্কারের প্রমাণ দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি দুর্বলতা ছিল। সেই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠার জন্য যথোপযুক্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তিনি দিতে পারছিলেন না। আর সেই জায়গাটিকে ধরে অন্যান্য বৈজ্ঞানিকরা তাকে চেপে ধরতেন, খারাপ ব্যবহার করতেন এবং তাকে চর্তুদিকে পাগল প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করতেন। অ্যাটোলুই যদিও তা গ্রাহ্য করতেন না। ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস ও ঈশ্বর চিন্তাই তার বাঁচার পাথেয় ছিল। তার বিজ্ঞানের ভাল প্রমাণের জন্য প্রায়ই তিনি দিনরাত্রি ল্যাবোরেটিতে কাটাতেন। রোজই যখন গভীর রাতে বিছানায় শুতে যেতেন, যতক্ষণ জেগে থাকতেন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে যেতেন, প্রভু এই পরীক্ষা প্রমাণ করার পথ বলে দাও। তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, একদিন ঈশ্বর দয়া করবেন। সেটাই ছিল ঈস্টারের রাত, শোবার আগে অ্যাটোলুই প্রতিদিনকার মত প্রার্থনা করে

শুতে গেলেন। তিনি যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন তখন তিনি স্বপ্ন দেখলেন, সত্যিই যে স্নায়ুর জন্য অনুঃসৃত একটি রাসায়নিক পদার্থ আছে এবং সেটা প্রমাণ করার জন্য যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগুলি প্রয়োজন সেগুলি একের পর এক চোখের সামনে ভেসে উঠছে সানন্দ্য। বিস্ময়ের মধ্যেই তার স্বপ্ন ভাঙল। ঘড়িতে তখন রাত দুটো। ঘুমের ঘোরেই তিনি তাড়াতাড়ি একটি কাগজ ও পেন খুঁজে নিয়ে তাতে সমস্ত পরীক্ষার পদ্ধতিগুলি কোনক্রমে লিখে ফেললেন। ভীষণ ঠাণ্ডার রাত, তখন আবার মোটা কম্বল গায়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। সকালে ঘুম ভাঙতেই, সেই কাগজটা নিয়ে পরীক্ষাগুলি দেখার জন্য ব্যগ্রভাবে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু কাগজটা বার কয়েক দেখার পর দুঃখে ভেঙে পড়লেন। ঐ মধ্যরাত্রে আধ ঘুমের মধ্যে উনি যা লিখেছেন তার অধিকাংশই তিনি পড়তে পারছেন না, এমনই হিজিবিজিতে ভরা তার লেখা। একা ঘরে বসে কাঁদতে লাগলেন। খাওয়া-দাওয়া সব ভুলে, কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন—"হে ভগবান তুমি আমাকে দিলে অথচ আমি নিতে পারলাম না। তুমি আমাকে ক্ষমা কর, তোমার অসীম দয়া দিয়ে আমাকে বাঁচাও। আরেকবার আমাকে এই সুযোগ দাও।" এই প্রার্থনা বার বার করতে লাগলেন এটা সারাদিন ধরে চলল, রাত হয়ে এল। কান্না ও প্রার্থনা চলতেই থাকল। এরকমাবস্থায় কখন এক সময় তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, সেই স্বপ্ন আবার ফিরে এল। এবার আর ভুল করলেন না। স্বপ্ন ভাঙতেই খাতা নিয়ে পুরোটা সুন্দর করে লিখে ফেললেন। তারপর হাতের খাতাটি নিয়ে মধ্যরাত্রেই রওনা দিলেন ল্যাবোরেটরির উদ্দেশ্যে। সেদিন রাত থেকে পরের দিন সকাল থেকে বিকেল গড়িয়ে রাত পর্যন্ত গবেষণার সমস্ত জিনিস সাজিয়ে ফেললেন। কয়েকদিনের মধ্যেই দেখতে পেলেন গবেষণার ফল পরিষ্কার ভাবে প্রমাণ করে দিচ্ছে যে স্নায়ু থেকে নিঃসৃত হচ্ছে একধরণের রাসায়নিক পদার্থ যা পরবর্তীকালে অ্যাসিটাইল কোলিন (Acetyl Cholin) নামে বিখ্যাত হয়। যেদিন সেটা পেলেন, ঘরে এসে হাত জোড় করে নিজের মনেই বলে উঠলেন, আমি যে জন্য এতদিন ধরে তোমার পথ চেয়ে থাকতাম, জানতাম একদিন তোমার কৃপা হবে, এই আবিষ্কার তোমার উপর বিশ্বাসকে দৃঢ় করে রাখতে পারার জন্যই সম্ভব হল।

১৯৩৬ সনে অ্যাটোলুই-এর এই আবিষ্কারের জন্য নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়। আশ্চর্যের বিষয় নোবেল প্রাইজ পেলে যে বক্তৃতাটা দিতে হয়, সেখানে উনি এই ঘটনার কথা বলে ফেললেন। এতে অন্যান্য বৈজ্ঞানিকরা খুব বিরক্ত হলেন, অনেকেই ওনার নিন্দে করতে লাগতেন, কাগজের লোকেরা তাকে ছেঁকে ধরে জিজ্ঞেস করল যে, বিজ্ঞানের মধ্যে আপনি ভগবানকে নিয়ে এলেন—এটা কেন করলেন? এরকম অনেক কথাই চলতে থাকল। এইসব কোন কথাকে গ্রাহ্য না করে অ্যাটোলুই শেষে উত্তর দিলেন, "যা সত্যি আমি তাই বলেছি। বিজ্ঞান তো সত্যিকেই ধরে থাকে, তাহলে অসুবিধা কোথায়!" পরদিন খবরের কাগজে ওনাকে ব্যঙ্গ করে অনেক লেখা বেরিয়ে ছিল।

যেটার জন্য অ্যাটোলুই-এর প্রসঙ্গ এখানে তুললাম তা হলো সারাজীবন ধরে উনি শুধু এই একটি পথকেই শক্ত করে ধরেছিলেন, বিজ্ঞান ছাড়া, আর তাহলো সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাসের পথ। অনেক রকম যন্ত্রণা উনি জীবনে পেয়েছেন কিন্তু কখন এই পথ থেকে বিচ্যুত হন নি। তার বিজ্ঞানের যে অসামান্য সাফল্য তা ঈশ্বরের দান বলে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই বিশ্বাসকে অটুট রেখেছেন। আমরা সাধারণত বিশ্বাসকে ধরে রাখতে পারি না, অবিশ্বাসেই আমাদের বেশী আকর্ষণ, সেজন্যেই জীবনের আসল পথ আমরা খুঁজে মরি কিন্তু তা পাই না।

—০—

যতক্ষণ শরীরের ক্ষমতা আছে তপস্যাটা রেখে যাবে, এই তপস্যাই আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে। বলতে পারবে ঠাকুর যখন শরীরের ক্ষমতা ছিল তখন তোমায় ডেকেছি, এখন পরিত্যাগ করলে চলবে না। মুণ্ডকোপনিষদে আছে তপস্যা চীয়তে ব্রহ্ম। তপঃ প্রভাবাদ্দেব প্রসাদাচ্চ (শ্বেঃ)। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব (তৈত্তি)।

—শ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেব

জগৎ বরেণ্য শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রী মৃগাঙ্ক ভূষণ নিয়োগী

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসক নবাব সিরাজদ্দৌলা ব্রিটিশ শক্তির নিকট পরাজিত হন। এর কয়েক বৎসরের মধ্যেই সমগ্র ভারতবর্ষ ব্রিটিশের করায়ত্ব হয়।

ভারতের উপর ব্রিটিশের এই প্রভাব আরও গভীর ও যুগান্তকারী হল যখন দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন হল। আগে শিক্ষা হত সংস্কৃত ভাষায় অথবা আরবী বা ফার্সী ভাষায়, এখন ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা হতে লাগল। বেদ বেদান্ত, ন্যায়, ব্যাকরণ ইত্যাদির পরিবর্তে এখন পাশ্চাত্য দর্শন ও সাহিত্য পড়ানো হতে লাগল।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই সংঘাত ভারতের শুধু অনিষ্ট করেছে ভাবলে ভুল হবে। এর দ্বারা ভারতের মহৎ কল্যাণও হয়েছে। হঠাৎ পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে এসে ভারতের চমক ভাঙলো। সে দেখলো সে যা জানে তার বাহিরে অনেক কিছু জানার আছে। ভারত দেখলো পাশ্চাত্যের জ্ঞানভাণ্ডার যেন এক নতুন জগৎ।

ঊনবিংশ শতাব্দীকে ভারতের এক গৌরবময় যুগ বলা হয়। এই যুগে কী রাজনীতি, কি ধর্ম, কি সাহিত্য, কি বিজ্ঞান সব ক্ষেত্রে নূতন নূতন প্রতিভার বিকাশ দেখতে পাই। যেন পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রত্যক্ষ আশীর্বাদ—এ সত্য স্বীকার করতেই হবে।

ঠিক এখনই এই মহানগরীর উপকণ্ঠে দক্ষিণেশ্বরে অদ্ভুত এক পুরুষের আবির্ভাব ঘটে। তিনি বুঝিয়ে দিলেন মানব প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিণতি আধ্যাত্মিকতায়, আর সব গৌণ, মুখ্য—কোন প্রকার অমৃতত্ত্ব লাভ করা। তিনি যেন ভারতের ভাগ্য বিধাতা, ভারতের যে মহৎ, তার ধর্ম যে মিথ্যা নয়, তা প্রমাণ করবার জন্যই তিনি আবির্ভূত হলেন।

রামকৃষ্ণদেব জন্মগ্রহণ করেন বাংলাদেশেরই এক প্রান্তে হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে। তাঁর জন্ম হয় ১৮৩৬ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী বুধবার শুক্লা ফাগুন দ্বিতীয়া তিথিতে।

পিতা ক্ষুদিরাম গয়াধামে যান পিতৃপুরুষের প্রতি পিণ্ডদান করতে। সেখানে বিষ্ণুমন্দিরে পূজা দেবার পরই তিনি স্বপ্ন দেখেন—বিষ্ণু যেন এসে তাঁকে বলছেন, তাঁর পুত্র হয়ে তিনি আবির্ভূত হবেন। এর পর রামকৃষ্ণের জন্ম হয় বলে ক্ষুদিরাম পুত্রের নাম রাখেন গদাধর।

গদাধরের নাম কি করে রামকৃষ্ণ হল তা জানা যায় না—খুব সম্ভব তাঁর গুরু তোতাপুরী উত্তরকালে এই নাম দেন। বিধিমত তাঁকে মা চন্দ্রমণি পাঠশালায় পাঠালেন বিদ্যাশিক্ষার জন্য কিন্তু "চাল কলা বাঁধা বিদ্যে" তাঁর আদৌ হল না। পাঠশালা যাওয়া একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। তাঁর ঝোঁক দেখা গেল চারুকলায় —সঙ্গীতে, অভিনয়ে, মূর্তিনির্মাণে; যেমন অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি ছিল তাঁর, তেমনই অদ্ভুত ছিল তাঁর অনুকরণ করবার ক্ষমতা, যা একবার শুনতেন দেখতেন তা পূর্ণ আয়ত্ব হত। যাত্রা, কথকতা, রামায়ণ মহাভারত একবার শুনলেই কণ্ঠস্থ হত। ধরা বাঁধা নিয়মে তাঁর শিক্ষা না হলেও সাধারণ জ্ঞান, বিচার ক্ষমতা তিনি সমবয়স্কদের অনেক উর্ধ্বে ছিলেন।

বড় ভাই রামকুমার রামকৃষ্ণের উপনয়নের আয়োজন করতে লাগলেন। উপনয়নের সময় সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ বালককে স্বীয় জননীর নিকট হতে প্রথম ভিক্ষা নিতে হয়। তিনি ভিক্ষা দিলে তবে অন্যান্য আত্মীয়স্বজন ভিক্ষা দেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ ধরে বসলেন—তাঁকে প্রথম ভিক্ষা দেবেন ধাত্রীমা। এই ধাত্রী মা ছিলেন শূদ্র তনয়া, নাম ধনী। তাঁকে অনেক বোঝানো হল কিন্তু একরোখা ভাই সেই ধনীর কাছ থেকেই ভিক্ষা নিলেন।

এর কিছুদিন পর রামকুমার অর্থোপার্জনের সুবিধার জন্য কলকাতায় এসে চতুষ্পাঠী খুললেন। অধ্যাপনা ও যজন-যাজন এর দ্বারা কোনভাবে কষ্টেসৃষ্টে সংসার চলতো। ভাই রামকৃষ্ণকে উভয়ের সুবিধার জন্য, কলকাতায় চতুষ্পাঠীতে নিয়ে এলেন। এখানেও তিনি কিছুই করলেন না। তাঁর লাবণ্যময় কান্তি, মধুর কণ্ঠসংগীত ও সুমিষ্ট ব্যবহারে পাড়ার সকলের মন জয় করে ফেললেন।

এই সময় অর্থাৎ ১২৬২ সাল, ১২ই জ্যৈষ্ঠ

কলকাতায় রাণী রাসমণি বহু সমারোহে কলকাতার উত্তরে দক্ষিণেশ্বরে এক কালী মন্দির, বিষ্ণুমন্দির, ও দ্বাদশ শিব মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করলেন। রামকুমার প্রথমে মন্দির প্রতিষ্ঠার পুরোহিত এবং পরে কালীমন্দিরের স্থায়ী পুরোহিত নিযুক্ত হলেন। অর্থাগম তাঁর কিছু বাড়লো। রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ও দাদার সঙ্গে থেকেও নিজের খেয়াল খুশী মত ঘুরে ফিরে সময় কাটাতে লাগলেন।

এই অবস্থায় রাসমণির জামাতা মথুর বাবুর দৃষ্টি তাঁর উপর পড়লো এবং তিনি চাইলেন রামকৃষ্ণ যেন দেবীপূজার কোন না কোন কাজে নিযুক্ত থাকেন। পরে রাণীর জামাতা মথুর বাবুর অনেক অনুরোধ উপরোধে দেবীর অঙ্গসজ্জা, ক্রমে পূজা করতেও সম্মত হলেন। আকস্মিকভাবে দাদার মৃত্যু হওয়ায় শেষে দেবীমন্দিরের পূজার ভার রামকৃষ্ণের উপর অর্পিত হল।

রামকৃষ্ণের পূজা দেখবার মত ছিল। তিনি যেন সত্যিকারের মা কালীকে সামনে দেখছেন এবং দেখতে দেখতে পূজা করছেন। বিধিবদ্ধ পূজায় তাঁর মন ভরতো না। মাকে কত গান শোনাতেন ক্রমে তাঁর মনে হল এত ভক্ত মায়ের দর্শন পেয়েছেন, তিনি দর্শন পাবেন না কেন? দিনের পর দিন মায়ের মন্দিরে গিয়ে কাতরভাবে বারবার মাকে বললেন দেখা দিতে। যখন কোন সাড়া পেলেন না তখন সত্যসত্যই পশুবলির খড়্গ দিয়ে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হলেন। এইসময় মা এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন আর সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণ মূর্ছিত হয়ে ভূতলে পড়ে গেলেন। এরপর হতে তিনি মাকে নিয়েই সবসময় থাকতেন। তিনি যেন ছোট্ট শিশু মাকে ছাড়া এক মুহূর্তও থাকতে পারতেন না। মুখে সবসময় মা—মা ভুলি যেন সর্বদা সবমনে মাকে দেখছেন। মাকে জিজ্ঞাসা না করে কিছু করেন না, মা যেমন বলেন, তিনি তেমন করেন, কখনও মায়ের ওপর অভিমান, কখনও মায়ের সঙ্গে রঙ্গরস, সে এক স্বর্গীয় দৃশ্য। না দেখলে কখনই ধারণা করা যায় না।

সাধারণ লোক তাঁকে বদ্ধ পাগল ভাবতে লাগল। সত্যই উন্মাদের মত তাঁর ব্যবহার ছিল—স্নানাহার সম্বন্ধে উদাসীন, পরণে অনেক সময় কাপড় থাকতো না। এই সময় ভাগিনেয় হৃদয় তাঁর দেখাশুনা না করেল, তাঁর শরীর থাকতো কিনা সন্দেহ। রামকৃষ্ণের এই অবস্থার কথা জানতে পেরে বাড়ীর লোকেরা খুবই চিন্তিত হলেন। তারা তাঁকে বাড়ীতে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর বিবাহ দিবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন।

যথাসময়ে বিবাহ হয়ে গেল, বিবাহ হল পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক বালিকার সঙ্গে নাম সারদামণি। বউয়ের বয়স ৫ এবং বরের বয়স ২৩, এ রকম বিবাহ সে যুগে চলতি ছিল। কিছু দিন গ্রামে থেকে তিনি দক্ষিণেশ্বরে ফিরলেন। কোন প্রকার মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল না। বরং এরপর থেকে তিনি নবউদ্যমে মাতৃসাধনায় মেতে উঠলেন। আশ্চর্যের বিষয়, যা আয়ত্ব করতে লোকের জন্ম-জন্মান্তর লেগে যায়, তা অনায়াসে এবং অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর অধিগত হয়ে যায়।

হিন্দু মতের যত সাধন প্রণালী সব তাঁর আয়ত্বে আসলো, বাকী রইল কেবল অদ্বৈত বেদান্ত। রামকৃষ্ণের এই মতের প্রতি আকর্ষণ ছিল না, কারণ এতে ঈশ্বর ও জীব বস্তুতঃ এক এইরূপ ভাবতে হয়। কিন্তু এই সময় দক্ষিণেশ্বরে তোতাপুরী নামে এক নাগাসাধু এসে হাজির। তিনি ছিলেন অদ্বৈত সন্ন্যাসী। রামকৃষ্ণকে অপূর্ব আধার বুঝতে পেরে তাঁকে অদ্বৈত মতের সাধন করতে বললেন। ঠাকুর প্রথমে আপত্তি করলেও শেষে সম্মত হলেন। নির্বিকল্প সমাধি যা অত্যন্ত দুঃসাধ্য বলে সুপরিচিত রামকৃষ্ণ তা অবিলম্বে লাভ করলেন। তোতাপুরী এ দেখে অবাক হলেন এবং শিষ্যকে তাঁর এত ভাল লাগলো যে যেখানে তিনি তিন রাত্রির বেশী থাকেন না, সেখানে তিনি কয়েক মাস দক্ষিণেশ্বরে রয়ে গেলেন। এর ফলে গুরুর যে সব অনুদারতা ছিল শিষ্যের সান্নিধ্যে তা দূর হল।

সঙ্গে সঙ্গে কোথা হতে এক সুফী দরবেশ এসে হাজির। তাঁর সহায়তায় তিনি ইসলাম সাধনে মেতে উঠলেন, হিন্দুর আচার বিচার, পোষাক পরিচ্ছদ, হিন্দুধর্ম চিন্তা সব মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলেন। কোন অসুবিধা হল না, অচিরে সিদ্ধিলাভ হল।

তখন ভারতে সবার মুখে এক কথা—স্বর্গ চাও তো আমাকে অনুসরণ কর, নচেৎ তোমার ভাগ্যে অনন্ত নরক।

এর মধ্যে রামকৃষ্ণ ঘোষণা করলেন—"যত মত তত পথ", "যা পেটে, যা সয়" সে সেইরূপ মত নিয়ে চলুক।

এরপর মথুরবাবু রামকৃষ্ণকে নিয়ে কিছুদিনের জন্য তীর্থ ভ্রমণে যান। পথে দেওঘরে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। সেবার দেওঘরে ভয়ানক অন্নকষ্ট, ক্ষুধার তাড়নায় তাড়িত হয়ে লোক রেল স্টেশনের আশে পাশে ভিক্ষার আশায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঠাকুর ঐসব লোকদের পেট ভরে খাওয়া ও একখানি করে কাপড় দিতে মথুর বাবুকে বললেন। মথুরবাবু নানারূপ ওজর আপত্তি করলে রামকৃষ্ণ জানিয়ে দিলেন তাঁর তীর্থে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। শুধু তাই নয়, তিনি ঐসব দরিদ্র লোকেদের মধ্যে গিয়ে বসে রইলেন। অনন্যোপায় হয়ে মথুরবাবু এটা মেনে নিলেন এবং তারপর তাঁরা আবার রেলে চড়লেন।

তীর্থাদি দর্শন করে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এলে সারদাদেবী তাঁর নিকট এসে বাস করতে লাগলেন। সারদাদেবীকে তিনি দেবী জ্ঞানে বরণ করে নিলেন। একদিন মা রামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি আমাকে কি দৃষ্টিতে দেখ?" শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন—"মন্দিরে যে মা আছেন, আর নহবতে যে গর্ভধারিণী মা আছেন, সে মা-ই এখন আমার সম্মুখে।" রামকৃষ্ণ যে সম্পদ সারাজীবনে আহরণ করেছিলেন সারদাদেবী সে গুলি আয়ত্ব করলেন। বস্তুতঃ সারদাদেবীই রামকৃষ্ণের প্রথম শিষ্যা। ঠাকুরের তিরোধানে মা-ই তাঁর শূন্য আসন পূরণ করেন।

এর কিছুকাল আগে হতেই রামকৃষ্ণের অতিমানব জীবনের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কেউ কেউ তাঁকে অবতার বলে প্রচার করতে থাকেন। যাঁরা তাঁর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ দিকপাল পণ্ডিতরা তাঁর কথা বিনম্র চিত্তে শুনেছেন।

ঠিক সেই সময় স্কটিশ চার্চ কলেজের একজন অধ্যাপক হেস্টিসাহেব তাঁর ইংরাজী ক্লাসে রামকৃষ্ণের কথা বললেন। এই ক্লাসে ছিলেন এক প্রতিভাবান ছাত্র—নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত, উত্তরকালে বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দ। একদিন নরেন দু একজনকে সঙ্গে নিয়ে ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরে দর্শন করতে এলেন। ঠাকুর তাঁকে একান্তে নিয়ে গিয়ে অনেক আদর যত্ন করলেন। বললেন—তিনি নাকি নরঋষি জগৎ কল্যাণে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর সুললিত কণ্ঠের গান ঠাকুর শুনলেন।

নরেনের বুঝতে বিলম্ব হল না ধর্ম জগতে রামকৃষ্ণ একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি। যখন তাঁর মধ্যে ধর্ম পিপাসা প্রবল হল তখন তিনি ঠাকুরের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। ঠাকুর নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ সব যুবকদের নানা ভাবে শিক্ষা দিয়ে ভবিষ্যতে যাতে তাঁরা একটি সন্ন্যাসী সংঘ স্থাপন করে তাঁর ভাব ও আদর্শ রক্ষা ও প্রচার করতে পারেন সেইভাবে তাঁদের প্রস্তুত করতে লাগলেন। নরেন্দ্রনাথকে এই দলের দলপতি নির্বাচিত করলেন।

রামকৃষ্ণের সব অমৃতময়ী বাণী শ্রীম অর্থাৎ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁর "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে" লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন—এই পুস্তক ধর্মসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ রূপে জগতে সমাদৃত।

১৮৮৫ সালে তিনি গলায় ক্যানসার রোগে শয্যাশায়ী হন। ১৮৮৬ সালে ১৬ই আগষ্ট তিনি মহাসমাধি লাভ করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশবাণী—

* মানুষ আপনাকে চিনতে পারলে ভগবানকে চিনতে পারে। 'আমি কে' ভালরূপে বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায়, আমি বলে কোন জিনিস নেই। হাত-পা-রক্ত-মাংস ইত্যাদি এর কোনটা আমি? যেমন প্যাজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কেবল খোসাই বেরয়, সার কিছু থাকে না, সেইরূপ বিচার করলে আমিত্ব বলে কিছু পাই না। শেষে যা থাকে, তাই আত্মা—চৈতন্য।

* দুই রকম আমি আছে—একটা পাকা আমি, আর একটা কাঁচা আমি। আমি তাঁর দাস, তাঁর সন্তান, আমি সেই নিত্যমুক্ত জ্ঞানস্বরূপ—এগুলি পাকা আমি। আমার বাড়ী, আমার ধনদৌলত, আমার সন্তান—এগুলি কাঁচা আমি।

* আমার আমিত্ব দূর হলে ভগবান দেখা দেন।

———————————

তথ্যসূত্র ঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব—স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

পৃথিবী আনন্দময়

সুখেন্দ্রনাথ রায়

এ পৃথিবী চির আনন্দময়ীর আবাসভূমি। চিদানন্দময় চিৎঘন আনন্দের রসঘনতায় তাই তো কোন কোন হৃদয়াকাশে ব্রহ্মের দর্শন ঘটে। কোন কোন যোগীপুরুষ প্রবর সেই ব্রহ্মময়ীর দর্শন লাভ করেন। কারণ এই মরজগতেই তো জীবনের পূর্ণ উপলব্ধি লাভ ঘটে। ভালমন্দ সুখ দুঃখের মাঝেও জীবন এক অনাস্বাদিত চেতনা প্রবাহ। আবার আত্মসুখ লোলুপতায় স্বার্থ দ্বন্দ্বে হানাহানি মারামারিতে সেই আনন্দময় সুখ ঢাকা পড়ে যায়। এই সুধাময় পৃথিবীতে তাই তো আমার সে আনন্দময় সুখকে উপলব্ধি করতে পারিনে। নিবিড় সুখময় আনন্দধারা সেখানে গরলে পর্যবসিত হয়। তাই তো কবির চিত্ত বীণায় ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

"তোমার কথা হেথা কেহ তো বলে না,
করে শুধু মিছে কোলাহল।
সুধাসাগরের তীরেতে বসিয়া
পানি করে শুধু হলাহল।।"

স্বার্থ দ্বন্দ্বের নীচতা ও হীনমন্যতায় আমরা পৃথিবীরূপ সুধাসাগরের তীরে বসে শুধু আত্মকোলাহলে মগ্ন হই এবং সুধাপান করার পরিবর্তে কালকূট গরল পানে মত্ত হই। আর এই সুধাময় রূপে রসে পরিপূর্ণ পৃথিবী যাঁর সৃষ্টি তাঁর কথা একেবারেই ভুলে যাই। কবি আমাদের দুর্লভ জীবনের সুধা সাগরের মধুরতার কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

আমাদের জীবন আনন্দসাগর থেকেই উদ্ভব এবং আমরা মরণরূপ বিস্মৃতির মধ্য দিয়ে সেই আনন্দময় রূপের সঙ্গে মিলিত হই। প্রাচীন বৈদিক ঋষি কবিরা সেই আনন্দসাগর থেকে আমাদের প্রকাশের কথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন।

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে
আনন্দের জাতানি জীবন্তি
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।।"

আনন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে ভূত-সকল উৎপন্ন হইয়া আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম কর্তৃক জীবিত রহে এবং প্রলয়কালে আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মের প্রতি গমন করেও তাহাতে প্রবেশ করে।

সুতরাং আমাদের জীবন আনন্দময় এবং মৃত্যুর পরেও সেই আনন্দময় তরঙ্গেই বিলীন হয়। ফলে জীবনের এই আনন্দ তরঙ্গে দুঃখের কোন স্থান নেই। জাগতিক সুখ-দুঃখ তখনই শুরু হয় যখন আত্ম কলহ লালসা হিংসাদ্বেষ ও দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। তাছাড়া সমস্ত আনন্দ ধারায় জীবন স্নাত ও স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে ? কবি এই আনন্দধারা স্নাত সুন্দরের স্নিগ্ধতায় চিত্রে অনাবিল আনন্দে মুগ্ধ হয়ে ওঠেন। তাই তো কবি ছন্দ সুধার সুরে বলে ওঠেন।

"জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।
ধন্য হল, ধন্য হল মানবজীবন।।
নয়ন আমার রূপের পুরে সাধ মিটায়ে বেড়ায় ঘুরে,
শ্রবণ আমার গভীর সুরে হয়েছে মগন।।"

কবি জগতের আনন্দযজ্ঞে নিমন্ত্রণ পেয়ে জীবন ধন্য করেছেন। আনন্দময় ও রূপময় পৃথিবীতে রূপের পূজারী কবি সুন্দরের লালিত্য সুধায় মুগ্ধ। রূপমাধুরীপূর্ণ কবির নয়ন পৃথিবীর সৌন্দর্যময় রূপের পুরে সাধ মিটিয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং রূপপিপাসু চোখ দিয়ে কবি সুন্দরের পসরায় অন্তর পূর্ণ করেন। আর লালিত্যময় সুরের মূর্চ্ছনায় কবির শ্রবণেন্দ্রিয় মগ্নতায় সার্থকতা লাভ করে।

কবির সুখ দুঃখে অন্তর মাঝেও এই জাগতিক মাটির বাসাও কবিকে সুখের আলিম্পনে মুগ্ধ করে। এরই মাঝে কবি নানা স্বপ্নের জাল বুনে চলেন। এখানে ব্যথার স্বর্গে যে দুঃখের আলো বিরাজ করে। সেই জাগতিক বেদনাতে কবি অখণ্ড আনন্দের স্পর্শ লাভ করেন এই পৃথিবীতে। কবির কথায় তাই ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

"এই যে কালো মাটির বাসা শ্যামল সুখের ধরা—
এইখানেতে আঁধার আলোয় স্বপন-মাঝে চরা।।
এরই গোপন হৃদয়'—পরে ব্যথার স্বর্গ বিরাজ করে
দুঃখে-আলো-করা।।"

আনন্দময় পৃথিবীতে রূপের অন্ত নেই। অজস্র রূপ মাধুরীতে কবিমন আকুল হয়ে ওঠে। প্রকৃতির স্নিগ্ধ রূপের স্রোতে কবি মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁরই রূপচেতনার কথা বলেন। জীবনের এই আনন্দময় সৌন্দর্য সুষমার প্রভায় কবি তাই

আনন্দে বলে ওঠেন।

"তোমারি মধুর রূপে ভরেছ ভুবন—
মুগ্ধ নয়ন মম, পুলকিত মোহিত মন।।
তরুণ অরুণ নবীনভাতি, পূর্ণিমাপ্রসন্ন রাতি,
রূপরাশি-বিকশিত-তনু কুসুমবন।।
তোমা-পানে চাহি সকলে সুন্দর,
রূপ হেরি আকুল অন্তর।।"

কবি এই পৃথিবীর রূপরাশিতে মুগ্ধ নয়নে মোহিত হয়েছেন। প্রতিদিনের প্রভাত সূর্যের আলোকচ্ছটা ও পূর্ণিমা রাত্রির মোহমদিরায় কবিমন আকুলিত হয়ে ওঠে। পৃথিবীর এই অকুণ্ঠিত সুন্দরের সুষমায় কবি নিমগ্ন হয়ে যান। এত সৌন্দর্য কবিকে বিস্ময়ান্বিত করে তোলে।

পৃথিবীর এই রূপ সৌন্দর্যময়তায় আর এক কবি বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে যান। কবিদের এই সৌন্দর্য প্রীতি মনের আকুলতা থেকেই কবি মনকে বিগলিত করে মুগ্ধ করে আপ্লুত করে এবং ভাবাবিষ্টতায় আকুল করে তোলে। তাই তো বিশ্ব প্রকৃতির জ্যোৎস্না প্লাবিত রাত্রে মুগ্ধ কবিমন বলে ওঠেন।

"চাঁদের মধুর হাসি, বিশ্বমুখে পুলক চুম্বন;
মিটি মিটি চেয়ে থাকা তারকায় করুণ নয়ন।"

কবির এই সৌন্দর্যপ্রীতি তাঁর ভাবুক মনের অভাবনীয় ভাবালুতা। তাই তো কবি ভাবতে পারেন চাঁদের হাসি যে এই সৌন্দর্যময় পৃথিবীর মুখে আনন্দ চুম্বনে পুলকের উচ্ছ্বাস ভরিয়ে দেয়। কবির এই ভাব তন্ময়তাই আমাদের কাছে আনন্দের উন্মেষ ঘটায়। তাই তো আমরাও ভাবতে পারি পৃথিবী সুন্দর ও আনন্দের রঙ্গভূমি। জীবন এখানে মহাসুন্দরের ক্ষণমাত্রের এক বিপুল প্রকাশ মাত্র। তাই তো জীবন দুর্লভ, জীবন সুন্দর, জীবন এক অনুভূতিপ্রবণ বিশ্বমায়ের আনন্দপ্রকাশ মাত্র। সুতরাং এ পৃথিবী তাই তো এত সুন্দর এত আনন্দময় এত নিসর্গ চিত্র বিসর্পিত বাস্তবের পটভূমি।

আনন্দময় পৃথিবীতে সকল কিছু মধুময় ও সুন্দরের অকৃপণ দান। তাই তো চারদিকে সুন্দরের অফুরন্ত সুষমা ছড়িয়ে আছে। জীবনে চলার পথে সেই সুন্দরের পরম অনুভূতি কবি সকল সময় অনুভব করেন। তাঁর সকল শরীর মন ইন্দ্রানুভূতি যেন সেই সুন্দরের স্পর্শ সুধায় মুগ্ধ হয়ে ওঠে। সুতরাং অনুভূতিপ্রবণ ও স্পর্শ কাতর কবি অনুভব করেন সেই সুন্দরের লালিত্য সুধা। তাই তো কবি বলতে পারেন।

"ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে,
ফুলের গন্ধে যেন লেগে উঠেছে মন মেতে,
ছড়িয়ে আছে আনন্দেরই দান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।"

কবির চলার পথে ধরণীর এক অনাস্বাদিত অনুভূতিতে শিহরণ জাগে সমস্ত শরীরের মধ্যে ও ফুলের সুগন্ধের মধুর আবেশে কবি চমকিত হয়ে ওঠেন এবং এই পৃথিবীর আনন্দময়তাই কবির মনকে মাতিয়ে তোলে। কবি তাই নিসর্গ চেতনায় মগ্ন হয়ে যান।

আনন্দময় পৃথিবীতে আমাদের নশ্বর জীবন প্রবাহ একদিন থেমে থাকে। তবুও এই পৃথিবীর রূপ রস শব্দ স্পর্শ ও গন্ধে ভরা সমস্ত প্রকৃতিই আমাদেরকে আনন্দে পরিপূর্ণ করে দেয়। সেই আনন্দধারায় স্নাত হয়ে আমরা এই মাটির মমতামাখা পৃথিবীকে অন্তর দিয়ে ভালবাসি। কারণ পৃথিবীর প্রতিটি ধুলিকণা গভীরভাবে আমাদেরকে নিবিড় আকর্ষণে আকর্ষিত করে। তার আনন্দ নিকেতন আমাদের জীবনকে পরিপূর্ণ আনন্দে ভরপুর করে দেয। তাই তো কবিও এই আনন্দময় পৃথিবীর মরজীবনেও এই বিশ্বপ্রকৃতিকে ভালবাসেন এবং কবির অন্তরের সেই নিবিড় ভালবাসার প্রতিচ্ছবি ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

"আমি জানি যাব যবে সংসারের
রঙ্গভূমি ছাড়ি
সাক্ষ্য দিবে পুষ্পবন ঋতুতে ঋতুতে
এ বিশ্বেরে ভালবাসিয়াছি।
এ ভালবাসাই মত, এ জন্মের দান।
বিদায় নেবার কালে
এ সত্য অম্লান হয়ে
মৃত্যুরে করিবে অঙ্গীকার।"

কবির এই ভালবাসার মত অতি সুপ্রাচীন কালে ও বৈদিক ঋষি কবিরা এই আনন্দময় পৃথিবীকে ভালবেসে

ছিলেন এবং অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিলেন মধুরময় পৃথিবীর এই আনন্দময় ভুবনকে। তাই তাদেরই উদ্গাতাতে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল।

“মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্ণ সন্তোষধীঃ।।
মধুনক্তমুতোষসো মধুমাৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দৌরস্তু নঃ পিতা মধুমান্নো বনস্পতি।।
মধুমাং অস্তু সূর্যঃ মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।
ওঁ মধুঃ ওঁ মধুঃ ওঁ মধুঃ।।”

সুতরাং বৈদিক কাল থেকে বর্তমান কালের কবিও এই আনন্দময় পৃথিবীকে জীবন দিয়ে অনুভব করেছেন। কারণ এই পৃথিবীই আমাদের ধরিত্রী মাতা। তিনি আমাদের ধারণ করে আছেন, তিনি আমৃত্যু আমাদের লালন করেন। তাঁর বক্ষসুধারূপ শস্যকণা ফলমূল আমাদের মুখে তুলে দিয়ে আমাদের শরীরকে পরিপুষ্ট করেন। তাই তো এই আনন্দময় পৃথিবীর সকল কিছুই আনন্দ রসে পরিপূর্ণ। “হে আনন্দ রূপিণী ধরিত্রী দেবী” তোমার আনন্দ সুধায় আমাদের জীবনধারা পরিপূর্ণতায় সুন্দর হয়ে উঠুক। তোমাকে শতকোটি প্রণাম।

—০—

সুকান্ত বসু

তুমি সতেরও মা, আবার অসতেরও মা।
তোমার চরণে মাগো দিও ঠাঁই।
বিশ্বজননী তুমি, বেঁধেছো সকলকে
আপন স্নেহের আঁচলে।
সবকিছু বিলিয়ে দিয়েছো তুমি মানুষের
শুভ-কল্যাণ কামনায়।
তুমি মা সারদা, একই দেহ লক্ষ্মী-সরস্বতী।
তোমার জ্বালানো প্রদীপ আজও
অক্ষয় অনির্বাণ জ্যোতিস্বরূপ।
তুমি শিখিয়েছো, শুধু ভালোবাসা দিয়ে
সারা বিশ্বকে জয় করা যায়।
সমস্ত তিমির অবগুণ্ঠনের মধ্যে
খুঁজে পাই তোমার স্নেহের অনন্ত শিখা।
সমস্ত বাধা আমরা পার হব মাগো।
তোমার আশীর্বাদ সঙ্গে নিয়ে
পেরিয়ে যাব ভালোবাসার পথ।
মাথার উপর ধ্রুবতারার মতো
জ্বলজ্বল করবে ঠাকুরের ঈশ্বর- কণা।

—০—

❖ নামকরণ ❖

পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজ তাঁর ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ(লীলাপ্রসঙ্গ’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—“দ্বাদশবর্ষব্যাপী অদৃষ্টপূর্ব অলৌকিক তপস্যান্তে শ্রীশ্রীজগদম্বা ঠাকুরকে বলেন—‘ওরে, তুই ভাবমুখে থাক।’ ঠাকুরও তাই করেন।”

‘ভাবমুখে’ কথাটির অর্থ ব্যাপক এবং আধ্যাত্মভাবে পূর্ণ। মনের সমস্ত বৃত্তি লোপ পাওয়ার পর মন যখন সংকল্প রহিত হয়ে সমাধিভূমিতে অবস্থান করে—তখন তাঁর মুখের কথাই ‘ভাবমুখে’-র কথা রূপে প্রকাশিত হয়।

অধ্যাত্মজগতের প্রতি আকর্ষক আহ্বান হিসাবে শ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেব এই পত্রিকার ‘ভাবমুখে’ নামকরণ করেন।

এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেব ছিলেন রামকৃষ(ময়। তাঁর জীবনের প্রতিটি স্পন্দনে অনুরণিত হত শ্রীরামকৃষ(-সারদা প্রেমভাব, যার স্ফুরণ দেখা যায় তাঁর রচিত গানে, কবিতায়, প্রবন্ধে ও জীবনের প্রতিটি ছত্রে। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাপার্ষদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তিম লীলাস্থল কাশীপুর উদ্যানবাটী ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ত্যাগী সন্তানদের দ্বিতীয় স্মৃতি বিজড়িত আলমবাজার মঠ উদ্ধার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। কাশীপুর উদ্যানবাটীটি পরে বেলুড় মঠকে হস্তান্তর করেন। অনুরূপে দক্ষিণেশ্বরে মায়ের স্মৃতিবিজড়িত নহবতখানায় মন্দির ট্রাস্টীদের সহায়তায় মায়ের পটমূর্তি স্থাপন করে পূজা ও আরাত্রিকের প্রথম ব্যবস্থা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ সকলের কাছে পৌঁছে দিতেই তিনি প্রকাশ করতে শু(করেছিলেন এই ***‘ভাবমুখে’*** পত্রিকাটি। এই পত্রিকাটির মাধ্যমে তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের, শ্রীমায়ের ও তাঁদের লীলাপার্ষদদের বিভিন্ন ঘটনা এবং আদর্শকে তুলে ধরতেই আমাদের এই নিরন্তর প্রয়াস।

শ্রী গোলোক সেন

প্রশ্ন ঃ স্বামীজী রচিত "নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতি" গানটির বিষয় মহেন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতি কথায় কি বলেছেন?

উত্তর ঃ তিনি লিখেছেন—"বরাহনগর মঠ স্থাপনের অল্পদিন পরে 'নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতি' সংগীতটি রচনা করেন নরেন্দ্রনাথ। গ্রীষ্মকাল, প্রাতে গিরিশবাবুর বাটীতে স্বামীজী গিয়েছিলেন এবং উপরকার ছাতের গরাদের কাছে বসে গুণ গুণ করে গানটি গাহিতেছিলেন। অতুল বাবু (গিরিশ বাবুর ভাই) জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁ হে, এ গানটা নূতন দেখছি যে, কার বাঁধা? মেজদাদার (গিরিশবাবুর) বাঁধা নয় তো?" নরেন্দ্রনাথ কোন কথা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করলেন না। অতুল বাবু বললেন, "ওহে ভাল করে একবার গাও না"।

শুনে মোহিত হয়ে অতুলবাবু বললেন, "এই গানটা যে বাঁধতে পারে, সে একটা বড়ো লোক—এই একটা গানের জন্য সে জগতে বিখ্যাত হয়ে থাকবে।"

নরেন্দ্রনাথ মুচকে মুচকে হাসতে লাগলেন এবং কিছু বললেন না। অতুলবাবুর গানটা এত ভালো লেগে ছিল যে, তিনি সকলকেই কার রচিত গান জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। অবশেষে শরৎ মহারাজ এটা নরেন্দ্রনাথের রচিত বলে দিলেন।"

সূত্র ঃ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী—১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৩

প্রশ্ন ঃ গিরিশচন্দ্র ঘোষের বুদ্ধ চরিতের সংগীত সম্বন্ধে মহেন্দ্রনাথ দত্ত কি বলেছিলেন?

উত্তর ঃ গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বুদ্ধচরিত' নাটকের সংগীত 'জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই' নরেন্দ্রের কণ্ঠে খুব উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবের সৃষ্টি করত। তখন বরাহনগর মঠে প্রারম্ভের দিনগুলি। রামকৃষ্ণ সন্তানদের মধ্যে তখন বৈরাগ্যের জোয়ার—বিশেষ করে নরেন্দ্রনাথের মধ্যে। এই সংগীত থেকেই নরেন্দ্র গাইতেন,

কে আছ চেতন ঘুমায়োনা আর
দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার,
করো তমোনাশ হও হে প্রকাশ
তোমা বিনা আর নাহিক উপায়
তব পদে তাই শরণ চাই।

এই গানটি নরেন্দ্রনাথ হৃদয়ের অন্তর হতে গাইতেন। সংগীতকালে যেন এক বৈরাগ্যের হিল্লোল তারদিকে প্রবাহিত হত। শ্রোতৃবর্গের মন যেন রাগ স্পন্দনের সঙ্গে কোথায় উঠে যেত। নরেন্দ্রনাথ যখন এই গানটি গাইতেন, তখন যেন প্রত্যক্ষ স্পষ্ট কি একটা ভাব উঠত। লোক যেন মাতোয়ারা হয়ে উঠত। সূত্র ঃ তদেব, পৃঃ ৬২

প্রশ্ন ঃ দেশের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে স্বামীজী কি বলেছিলেন?

উত্তর ঃ দেশের শিক্ষাব্যবস্থা দেখে স্বামীজী বলেছিলেন —"আজকালকার শিক্ষাপ্রণালী আগাগোড়া ভুল। কী করে চিন্তা করতে হয়, এটা জানবার আগেই মনটাকে বিভিন্ন বিষয় দিয়ে ভরে দেওয়া হয়। প্রথমে শেখানো দরকার মনঃসংযম। আমাকে যদি আবার নতুন করে পড়াশোনা করতে হত এবং এ বিষয়ে আমার স্বাধীনতা থাকত, তো আমি প্রথমে মনটাকে সংযত করতে শিখতাম এবং তারপর ইচ্ছা হলে আমি নানা বিষয় আহরণ করতাম। লোকেদের কোন কিছু শিখতে দীর্ঘকাল কেটে যায় এই জন্য যে, তারা ইচ্ছা মতো মনকে একাগ্র করতে পারে না।"

সূত্র ঃ যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ—৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৩

প্রশ্ন ঃ স্বামী সোমানন্দ তাঁর গুরু স্বামীজীর সম্বন্ধে কি বলতেন?

উত্তর ঃ সোমানন্দ নামে স্বামীজীর একজন দক্ষিণী চেলা ছিলেন। তিনি তাঁর প্রথম গুরু সন্দর্শনের কথা বলতেন —ঘুরে ঘুরে হিমালয়ের ওপর হিমালয়, সদৃশ শ্রেষ্ঠ পুরুষ স্বামীজীকে প্রথম দেখলাম। কোনো আশ্রম-টাশ্রম নয়, একলা থাকেন, সম্পূর্ণ ঈশ্বরের ওপর নির্ভরশীল, মাধুকরী করে আহার সংগ্রহ করেন। কিন্তু হলে কী হবে? ফকিরের আবরণেই তাঁকে বোধ হল a king of kings যেন রাজ রাজেশ্বর। সূত্র ঃ স্মৃতির আলোয় বিবেকানন্দ

প্রশ্ন ঃ বাবুরাম মহারাজ বরাহনগর মঠের এক অসাধারণ মুহূর্তের কথা লিখেছিলেন। কী সেই কাহিনী?

উত্তর ঃ "যোগে (যোগেন মহারাজ) বৃন্দাবন থেকে ফিরে এল, আনলে কতকগুলো তুলসীর মালা, একটা মালার ঝুলি আর তেলক মাটি। সকলের খাওয়া হলে প্রায় বারোটা

নাগাদ নরেন বললে, " ওরে যোগে, শ্যালা তো বৃন্দাবনে গেছিলি, দে শ্যালা আমাকে বৈরাগী সাজিয়ে দে।"

সকলে মিলে নরেন্দ্রনাথকে কপালে তিলক, গলায় কাটি, হাতে ঝুলি, আর তা থেকে জপ করবার জন্য আঙ্গুল বার করে দিয়ে এক ঢঙ সাজিয়ে দিলে। নরেন্দ্রনাথ প্রথম খানিকক্ষণ ব্যঙ্গ করে যেন কতই মালা জপ করছে—আওয়াজ করে বলতে লাগল—"আ—ধা—কে— ত্তো, আ—ধা—কে—তো, আ—ধা—কে—ত্তো" (রাধা কেষ্ট রাধা কেষ্ট) তারপর একটা গান ধরলে, নিতাই নাম এনেছে রে'। নাম কথাটা না বলে অপর একটা কথা বলে যোগেন মহারাজকে ভ্যাংচাতে লাগল। এইরকম কৌতুক, হাসি, ব্যঙ্গ চলছিল। অল্পক্ষণ পরেই হঠাৎ নরেন্দ্রনাথের মুখভঙ্গি, কণ্ঠস্বর ও অবয়ব সম্পূর্ণ বদলে গেল। সিংহ গর্জনে বলতে লাগলো, 'বোল হরি বোল, হরি হরি বোল' এর পূর্বে সকলে অসংযত চিত্তে বসে ছিল। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের সিংহ গর্জনে শুনে সকলেই ত্রস্ত হয়ে পড়ল। অবিরাম হুঙ্কার ধ্বনি, উদ্দাম নৃত্য ও কীর্তন। নরেন্দ্রনাথের এবং আর সকলের চোখ থেকে অশ্রুধারা পড়ে মুখ আর বুক ভেসে যাচ্ছে, কিন্তু নৃত্য কীর্তন বন্ধ নেই।

ক্রমে কীর্তনের রোল বরাহনগরের বাজার পর্যন্ত চলল। দোকান—পাসারিরা দোকান বন্ধ করে দৌড়ে আসতে লাগল। নিচেকার উঠান সব লোকে ভর গেছে, রাস্তায় লোক জমে গেছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে উপরকার বাইরের বারান্দায় কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে আছে। কেউ বা কীর্তন শোনবার ও দেখবার জন্য দোরের ফাটলে চোখ দিয়ে স্থির হয়ে বসে রয়েছে।

শশী মহারাজ ঠিক চারটের সময় ঠাকুরের বৈকালী দিতেন। অত কীর্তনের ভেতরেও শশী মহারাজ চট করে এসে ঠাকুরের বৈকালী দিলেন। আমি বাইরে এসে দেখি কিনা উঠানে কত লোক, রাস্তায় লোকারণ্য। কীর্তন আরো খানিকক্ষণ চলে বন্ধ হল, লোকেরা সব বলতে লাগল, "দাদা ঠাকুর, এমন কীর্তন কখনও শুনি নি, এমন মধুর হরিনাম কখনও শুনিনি।"

সূত্র ঃ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী --- মহেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃঃ ৪৭-৪৮

প্রশ্ন ঃ স্বামীজীর শিকাগো বাসের সময় এক ঘটনা ঘটেছিল, কী সেটা ?

উত্তর ঃ শিকাগোতে হেল ফ্যামিলি তে থাকবার সময় স্বামীজী মাঝে মাঝে কাছের লিঙ্কন পার্কে গিয়ে বসতেন হাওয়া খাওয়ার জন্য। একজন তরুণী মাতা তাঁর ছ'বছরের মেয়েটিকে নিয়ে ওইদিক দিয়ে বাজার করতে যেতেন। স্বামীজীকে দেখে মায়ের মনে একটা বিশ্বাস আসে, এবং তিনি তাঁর ছোটো মেয়েটিকে স্বামীজীর কাছে রেখে বাজার করতে যেতেন। তারপর থেকে প্রায় প্রতিদিন সকালেই শিশুটি আসত এবং স্বামীজী তাকে দেখাশুনা করতেন। অনেক বছর পর যখন মেয়েটি ষোল বছরে পদার্পণ করেছে, তার মা একদিন বিশ্ববিখ্যাত বিবেকানন্দের একটি ছবি পেলেন। মেয়েকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, দেখো তো, তোমার বন্ধুকে কি চিনতে পারছ? মেয়েটি চিনতে পারল। তারপর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। মেয়েটি বিবাহের পরে যখন অন্য জায়গায় গেছেন তখন স্বামীজীর স্মৃতি জেগে উঠল। ধীরে ধীরে মেয়েটি আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশ করল এবং আমেরিকার এক 'রামকৃষ্ণ বেদান্ত' কেন্দ্রের অনুরাগী হল।

সূত্র ঃ পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দ, মেরী লুই বার্ক, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৫

প্রশ্ন ঃ কেদারনাথ মন্দিরের মোহন্ত মহারাজ স্বামীজীকে দর্শন করতে এসে কি বলেছিলেন ?

উত্তর ঃ "স্বামীজী কলিতে আপনি সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ। জগতকে উদ্ধার করার জন্যই আপনার আসা। ইউরোপ ও আমেরিকাতে আপনার বিস্ময়কর শক্তি-পতাকা ইতিহাসে এক অদ্বিতীয় ঘটনা। প্রাচ্যের পতাকা আপনি পাশ্চাত্যের বুকে সগৌরবে তুলেছেন এবং প্রত্যেক হিন্দু এবং বিশেষ করে হিন্দু সন্ন্যাসী আপনার জন্যই নিজেদের গর্বিত মনে করবে।"

সূত্র ঃ স্বামীজীর স্মৃতি—মহেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃঃ ৫৬

জগদ্ধাত্রীরূপের মানে জানো? যিনি জগৎকে ধারণ করে আছেন। তিনি না ধরলে, তিনি না পালন করলে জগৎ পড়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। মনকরীকে যে বশ করতে পারে, তারই হৃদয়ে জগদ্ধাত্রী উদয় হন। —**শ্রীরামকৃষ্ণদেব**

সন্ন্যাসিনী গৌরীমা

দেবপ্রসাদ মজুমদার

শ্রীরামকৃষ্ণ আলোকে উদ্ভাসিত যে কয়েকটি স্ত্রী ভক্তচরিত্র আমরা লক্ষ্য করি এবং যাঁরা তাঁদের প্রাণভরা ভক্তি ভালবাসা দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা সারদাকে ঘিরে রেখেছিলেন সেই সকল পূতচরিতা মহীয়সী নারীদের মধ্যে গৌরীমা অন্যতমা।

এই সন্ন্যাসিনী চিরকুমারী তপস্বিনী গৌরীমার জীবনধারা ছিল বড় বিচিত্র ও অসাধারণ। বাল্যে পূর্বাশ্রমে তাঁর নাম ছিল রুদ্রাণী। কিন্তু তাঁর মা বাবা তাঁকে আদর করে ডাকতেন মৃড়ানী বলে। সিপাহী বিদ্রোহের বছরে ইংরাজী ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা ১২৬৪ সালে হাওড়া জেলার শিবপুর গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা পার্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। সাংসারিক কাজকর্ম ব্যতিরেকে তিনি সারাক্ষণ পূজা পাঠ নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। আর তাঁর মাতা গিরিবালা দেবী ছিলেন বিদুষী, সাধিকা ও বহু ধর্ম সংগীতের রচয়িতা। কেউ কেউ বলেন যে তিনি ছিলেন একজন উচ্চস্তরের কালী সাধিকা।

মৃড়ানীর জন্মের কিছু কাল পূর্বে গিরিবালা দেবী এক বিচিত্র অনুভূতি লাভ করলেন। একদিন গভীর রাত্রিতে তিনি স্বপ্ন দেখলেন যে গভীর অন্ধকারের মধ্য দিয়ে এক দিব্য জ্যোতি বের হয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে, আর কাছাকাছি এসে ঐ দিব্য জ্যোতি জগৎজননী মহামায়ার রূপ ধারণ করল, সেই মাতৃ শক্তিরূপিণী মহামায়ার কোলে এক অপূর্ব সুন্দর দেবকন্যা। গিরিবালা সেই শিশু দেবকন্যাকে গ্রহণ করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে দুহাত বের করলেন, সঙ্গে সঙ্গে সেই দিব্য মাতৃমূর্তি ঐ দেবকন্যাকে গিরিবালার কোলে তুলে দিলেন ও তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হলেন। গিরিবালার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। তিনি তাকিয়ে দেখলেন কিন্তু কিছুই দেখলে পেলেন না। কিন্তু এক দিব্য আনন্দের অনুভূতি তাঁর দেহমনকে আচ্ছন্ন করে রাখল। এর কিছু কাল পরে যখন মৃড়ানীর জন্ম হল, তখন গিরিবালা দেবী মনে করলেন যে সেই দেবকন্যাই এই মৃড়ানীর রূপ ধরে তাঁদের গৃহে অবতীর্ণ হয়েছেন। শিশু কন্যার রূপ লাবণ্যে সকলেই মুগ্ধ, পিতামাতা পরম যত্নে ঐ কন্যাকে লালন পালন করতে লাগলেন।

প্রাচুর্য না থাকলেও পার্বতীচরণ বাবুর গৃহে অভাব ছিল না, বরং সংসারে ছিল এক তৃপ্তি, সন্তুষ্টি, কিন্তু মৃড়ানীর মধ্যে ছিল না কোন শিশু সুলভ চাপল্য। সব সময় তার মধ্যে দেখা যেত এক শান্ত সমাহিত বৈরাগ্যের ভাব। অনান্য বালক বালিকার মত তার খেলাধূলায় মন ছিল না। কন্যা সন্তানের ভাল লাগার বস্তু গয়নাগাঁটি, পোষাক পরিচ্ছদ, সাজগোজ কোনকিছুতেই মৃড়ানীর কোন আগ্রহ ছিল না। সে সদাই চুপ চাপ থাকতে ভালবাসত। মৃড়ানীর এক মামা জ্যোতিষী ছিলেন, মৃড়ানীর ঐ সকল ভাবলক্ষ্য করে তার হাত দেখে বলেছিলেন—এই মেয়ে ভবিষ্যতে যোগিনী হবে।

বাল্যকাল থেকেই মৃড়ানীর খাওয়া দাওয়া বিষয়ে কোন আগ্রহ ছিল না, বাড়ীতে মাছ মাংস রান্না হলেও সে তা পছন্দ করত না এমন কি স্পর্শও করত না। পিতা মাতার ধর্মভাব বাল্যকাল থেকেই যেন তার মধ্যে প্রকটিত হয়েছিল। তিনি ঠাকুরের পূজা অর্চনা পছন্দ করতেন এ বাল্যেই মাটির শালগ্রাম শিলা গড়ে তাকে পূজা করতেন।

পিতামাতা কন্যা মৃড়ানীর শিক্ষার জন্য যত্নবান হলেন, প্রথমে তিনি তাঁর মায়ের কাছ থেকে বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষা করতে লাগলেন। তারপর তাঁকে এক মিশনারী স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হল। স্কুলে তিনি তাঁর অসাধারণ মেধার পরিচয় দিয়ে প্রত্যেক শ্রেণীতেই প্রথম স্থান অধিকার করতে লাগলেন। ঐ কৃতিত্বের জন্য একবার বড়লাট পত্নী তাঁকে একটি স্বর্ণ পেটিকা উপহার দিলেন।

একদিন বিকালে তাদের বাড়ীর সামনে কয়েক জন বালিকা খেলছিল আর একটু দূরে চুপচাপ বসে মৃড়ানী সেই খেলা দেখছিল, কিন্তু তার দৃষ্টি ছিল উদাসীন। ঐ সময় এক সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসী তার সামনে উপস্থিত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—সকলে খেলছে, আর তুমি চুপ চাপ বসে রয়েছ কেন? সন্ন্যাসীর কথা শুনে মৃড়ানী উত্তর দিলেন—আমার ঐ সব খেলা ভাল লাগে না। ঐ উত্তর শুনে সন্ন্যাসী খুশী হয়ে আশীর্বাদ করে বললেন—তোমার কৃষ্ণে মতি হোক।'

এরপর থেকে মৃড়ানীর বারবার ঐ সন্ন্যাসীর কথা মনে

হতে থাকল। তাঁর সান্নিধ্যে যাওয়ার জন্য তিনি ব্যাকুল হলেন। অবশেষে তাঁর বড় ভাই এর সাহায্যে তিনি সেই ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর খোঁজ পেলেন। ঐ সন্ন্যাসী তখন তাঁর পিসিমার শ্বশুর বাড়ীর গ্রামে বাস করছিলেন। সেই স্থানটি ছিল বর্তমান দক্ষিণেশ্বরের নিকটবর্তী এক নির্জন স্থান। মৃড়ানী যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তখন সেই সাধক ধ্যানমগ্ন। ধ্যানভঙ্গ হলে তিনি নৃড়ানীকে দেখে খুশি হলেন ও সেই সময় তাঁকে দীক্ষা দান করেন। এর অব্যবহিত পরে মনৃড়ানী কোথায় গেল, তাকে দেখতে না পেয়ে তার আত্মীয় স্বজনেরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেছিলেন, অবশেষে ঐ নির্জন স্থানে এসে ঐ সাধক সন্ন্যাসী ও মৃড়ানীকে দেখতে পেলেন। মৃড়ানীর আত্মীয় স্বজনদের দেখে ঐ সাধক বললেন—এ ছেলে মানুষ, একে আমি দীক্ষা দিয়েছি তোমরা একে কেউ বকাঝকা করো না। তবে কি জানো এ হলদে পাখী একে ধরে রাখা দায়।

আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে মৃড়ানী গৃহে ফিরে এলেন এবং গুরু প্রদত্ত মন্ত্র জপ করতে শুরু করলেন। এরপর হঠাৎ এক ব্রজবালী সাধিকা তাঁদের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হয়ে তাঁদের অতিথি হলেন। ঐ ব্রজবাসী সাধিকার সঙ্গে একটি নারায়ণ শিলা ছিল তিনি নিত্য ঐ নারায়ণ শিলাকে অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে সেবা পূজা করতেন, আর মৃড়ানী তার অন্তর দিয়ে অত্যন্ত আগ্রহে তার পূজা সাধন আরাধনা লক্ষ্য করত। এরপর যেদিন ঐ ব্রজবাসী সাধিকা তাঁদের বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছেন তিনি মৃড়ানীকে ডেকে তাঁর ঐ নারায়ণ শিলাটি দান করে বললেন—"এই ঠাকুর খুবই জাগ্রত, তোমার ভক্তি ও আন্তরিকতা দেখে, এঁকে তোমাকে দিয়ে গেলাম। তুমি এর সেবা পূজা করো এতেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।"

এর পরদিন থেকে মৃড়ানীর নিত্য কাজ হল ঐ নারায়ণ শিলার সেবা পূজা আরাধনা করা। পূজোর পরে অবসর সময়ে তখন তিনি রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র পাঠ করতেন। সারাদিন তাঁর খুব আনন্দে কেটে যেত। মৃড়ানীর এই সাধিকাভাব ও সংসার বিষয়ে অনাসক্তি লক্ষ্য করে তাঁর পরিবারের লোকজন ও আত্মীয় স্বজন তাঁর বিবাহের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। এবং অবশেষে তাঁরা তাঁর ভগ্নিপতির সঙ্গে তার বিবাহ ঠিক করলেন। এতে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। তাঁর মন যেন বার বার বলতে লাগল 'শ্রীমন নারায়ণই তোমার পতি'। তুমি কোন মানুষকে বিবাহ করে ঘর সংসার করবার জন্য জন্ম গ্রহণ করোনি। কোন উপায় না পেয়ে তিনি তাঁর মাকে বললেন—যদি আমাকে বিয়ে দেওয়াই তোমাদের স্থির সিদ্ধান্ত হয় তবে এমন এক বর এনে দাও যার কখনো মৃত্যু হবে না। মা মেয়ের কথায় গুরুত্ব দিলেন না, অবশেষে মানুষ বরের সঙ্গে বিবাহ স্থির হল। এবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মৃড়ানী বিবাহের নির্দিষ্ট দিনে ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে সারারাত্রি কাটিয়ে দিলেন। বিয়ে আর হতে পারল না। এর অল্প কয়েকদিন পরে মৃড়ানী ঘর ছেড়ে পালালেন। আত্মীয় স্বজনেরা অনেক খোঁজাখুঁজি করে তাঁকে ধরে বাড়ীতে ফিরিয়ে আনলেন। এরপর তার মনের পরিবর্তনের জন্য তাঁর মা ও আত্মীয় স্বজন তাঁকে নিয়ে নানান তীর্থ স্থান ঘোরালেন। কিন্তু তাতে তাঁর মনের অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটল না। তিনি মনে মনে গৃহত্যাগের সংকল্প করলেন। এরপর একদিন সুযোগ এসে গেল। তিনি কয়েকজন আত্মীয়ের সঙ্গে পৌষ সংক্রান্তিতে গঙ্গা স্নানে গেলেন। ইচ্ছা করে হারিয়ে গিয়ে একদল সন্ন্যাসীর সঙ্গে ভিড়ে তিনি হরিদ্বারে এসে উপস্থিত হলেন। এই সন্ন্যাসীরাই তাঁর নাম রাখলেন—'গৌরীমায়ী'। এরপর থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তথা সর্বকালের জন্য তিনি গৌরীমা নামে খ্যাত হলেন।

হরিদ্বারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সাধুদের সঙ্গ তাঁকে আনন্দ দান করত। তিনি সতত গঙ্গাতীরে তপ জপে মেতে থাকতেন, যা তাঁকে গভীর প্রশান্তি এনে দিত। গৌরীমা অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন। তাছাড়া ঐ সময় তিনি ছিলেন পূর্ণযৌবনা, তাই দুষ্ট, শয়তান, দস্যুদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি তাঁর সুদীর্ঘ কাল ঘন চুলের রাশি কেটে ফেললেন। তিনি কোথাও যোগিনীর বেশ ধারণ করলেন, আবার তীর্থদর্শনে বের হয়ে তিনি পুরুষের ছদ্মবেশে গৈরিক আলখাল্লা পরে বের হতেন। এই ভাবে বহু কষ্টে দুঃখে অনাহারে থেকে তিনি কেদারনাথ, বদ্রীনারায়ণ, অমরনাথ, জ্বালামুখী, পুষ্কর, বৃন্দাবন, মথুরা, পুরী প্রভৃতি বহু স্থানে

তীর্থ পর্যটন করতে লাগলেন। আর ঐ সকল স্থানে থেকে তিনি সাধন ভজনও করেছিলেন। তাঁর এই নিরলস সাধন ভজনে ও কঠোর কঠিন কৃচ্ছ্র সাধনে তিনি উচ্চস্তরের আধ্যাত্মশক্তি লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। সাধনায় তিনি সিদাবস্থা লাভ করেছিলেন। তাঁর দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়েছিল। বৃন্দাবনে থাকা কালে শ্যামসুন্দর তাঁকে দর্শন দানে কৃতার্থ করেছিলেন।

তিনি বৃন্দাবনে রয়েছেন এই সংবাদ পেয়ে তাঁর আত্মীয় স্বজনেরা তাঁকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনলেন। সকলের সঙ্গে তাঁর দেখা সাক্ষাৎ হল, কিন্তু সাংসারিক পরিবেশে থাকতে তিনি হাঁপিয়ে উঠলেন। তিনি বৃন্দাবনে ফিরে গেলেন। আবার কিছু দিন পরে তাঁর আত্মীয় স্বজনেরা তাঁকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনল। এবার তিনি এসে উঠলেন শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের শিষ্য বলরাম বসুর বাড়ীতে। এখানে কথা প্রসঙ্গে এক ভক্ত গৌরীমাকে বললেন যে দক্ষিণেশ্বরে এক ভাল সাধু আছেন, তিনি ইচ্ছা করলে তাঁকে দেখে আসতে পারেন। উত্তরে গৌরীমা বললেন যে জীবনে তিনি বহু সাধু সন্ত দেখেছেন, তাই নূতন করে কোন সাধু দেখার সাধ নেই তাঁর, তবে ঐ সাধুর যদি সত্যি ক্ষমতা থাকে তবে তাঁকে যেন তিনি টেনে নিয়ে যান। অন্যথায় নয়।

এর কয়েকদিন পরেই ঘটল এক সাংঘাতিক অঘটন। অন্যদিনের মত ঐ বলরামবসুর বাড়ীতে গৌরীমা তাঁর ইষ্টদেবতা নারায়ণ শিলার পূজাতে মগ্ন, হঠাৎ তাঁর নজরে এল ঐ নারায়ণ শিলার পাশে দুটি সুন্দর রক্তাভ চরণ কমল, আর আলো আশ্চর্যের কথা, তিনি তিন বার অর্ঘ্য দিলেন তাঁর ইষ্টদেব নারায়ণ শিলায় কিন্তু তা গিয়ে পড়ল ঐ চরণ যুগলের উপর। এইরূপ সাংঘাতিক কাণ্ড দেখে তিনি জ্ঞানহারা হয়ে মেঝেতে গড়িয়ে পড়লেন। তাঁর ঐ অবস্থা দেখে বলরামবাবুর স্ত্রী চিৎকার করে উঠলে সকলে দৌড়ে এসে জল হাওয়া দিয়ে তাঁকে সুস্থ করে তুললেন কিন্তু তিনি তাঁর বিহ্বলভাব কাটলেও কোন কথা বলতে পারলেন না। এই ভাবে ৫।৬ ঘন্টা কাটল। এবার তাঁর আর ঘরে থাকতে ইচ্ছা করছিল না, তিনি বার বার বাইরে বের হতে চাইছিলেন, মনে হচ্ছিল যেন কেউ তাঁর হৃদয়কে প্রবলভাবে আকর্ষণ করছে। গৌরীমা তখন মোটেই ঘরে থাকতে পারছিলেন না। সকালে তিনি ঘর থেকে বের হতে চাইলে বলরাম বাবু ও তাঁর স্ত্রী তাঁকে তাঁর অনুমতি নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে এসে হাজির করলেন।

দক্ষিণেশ্বরে যখন তাঁরা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহে উপস্থিত হলেন, তখন দেখলেন ঠাকুর একমনে সুতো জড়াচ্ছেন আর শ্যামাসঙ্গীত গাইছেন। আর লক্ষ্যণীয় যখন তাঁরা ঠাকুরের ঘরে ঢুকলেন, ঠিক তখনই ঠাকুরের সুতো জড়ানো শেষ হল। গৌরীমা বুঝতে পারলেন কে তাঁকে আকর্ষণ করছিলেন। এরপর বোধ করি অপেক্ষা করছিল, আর এক বিস্ময়। গৌরীমা যখন ঠাকুরকে প্রণাম করলেন তখন দেখলেন গতকালের সেই চরণ যুগল যা তিনি নারায়ণ শিলার পাশে অকস্মাৎ প্রকট হতে দেখেছিলেন। তাঁর মন আনন্দে আত্মহারা হল। তিনি বুঝলেন একদিন পর তিনি তাঁর প্রাণের ঠাকুরের দর্শন লাভ করেছেন।

এরপর থেকেই আমরা লক্ষ্য করি যে ঠাকুর ও শ্রীমার সেবাতে গৌরীমা নিজেকে সঁপে দিলেন। ঠাকুর ও গৌরীমা কে যথার্থ আধার বুঝতে পেরে তাঁকে যথোপযুক্ত ভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করলেন। এরপর ঘটল এক অসাধারণ ঘটনা। একদিন গৌরীমা দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির বাগানে ফুল তুলছিলেন, এমন সময় ঠাকুর তাঁর হাতের পাত্র থেকে জল ঢেলে বলছেন—'গৌরী আমি জল ঢালছি, তুই কাদা চটকা'। গৌরীমা ঠাকুরের কথার রহস্য বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলেন—এখানে কাদা কোথায় যে চটকাবো? ঠাকুর বললেন, দেখ, 'এদেশে মায়েদের বড় দুঃখ, তাদের লেখাপড়া শিখিয়ে উন্নত করতে হবে। তাদের দায়িত্ব তোমাকে গ্রহণ করতে হবে।'

এই বিষয়ে গৌরীমা প্রথমে আপত্তি করলেও পরে ঠাকুরের একান্ত ইচ্ছাতে তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে কাজে লেগে গেলেন। প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কয়েকজন ভক্তের সাহায্যে বারাকপুরের গঙ্গাতীরে শ্রীমা সারদার নামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন। এখানে প্রায় ২৫ জন কুমারী ও বিধবা আশ্রমবাসীনী হলেন, আর গৌরীমা তাদের প্রাচীন ভারতের আদর্শ নারী চরিত্র অপলা, ঘোষা, বিশ্বভারা, গার্গী, মৈত্রেয়ী, সতী, সাবিত্রীর আদর্শে গড়ে তুলবার চেষ্টা করতে

লাগলেন। এর কিছুদিন পরে তিনি বারাকপুর থেকে তাঁর আশ্রম তুলে নিয়ে এলেন কলকাতার গোরাবাগান অঞ্চলে। এরপর ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামবাজারে বর্তমান আশ্রমের জমি কিনে তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম ও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। মাতৃজাতিকে শিক্ষাদান ও ধর্মপথে স্বমহিমায় উদ্বুদ্ধ করাই ছিল তাঁর আশ্রম প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য গুরুনির্দিষ্ট লোক কল্যাণ ব্রত উদ্‌যাপন করে আশি বছর বয়সে এই মহিয়সী তপস্বিনী ইহলোক ত্যাগ করেন। ঐদিনটি ছিল ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ১ মার্চ।

গৌরীমা একাধারে ছিলেন পরিব্রাজিকা, তপস্বিনী, আচার্যা, কর্মশীলা। তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান ও বাগ্মিতা ছিল অসামান্য। বাংলার নারী সমাজে তিনি ছিলেন এক দুর্লভ রত্ন স্বরূপ। তাঁর দিব্যকান্তি, তেজস্বী স্বভাব, তাঁর অপূর্ব ত্যাগ ও সাধনা, তাঁর কর্মকুশলতা, আধ্যাত্মিক শক্তির ও চরিত্রের মাধুর্য আমাদিগকে প্রাচীন ভারতের বিদুষী তপস্বিনীদের কথাই স্মরণ করায়।

———————————

ঋণ স্বীকার ঃ

১) ভারতকোষ—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা,

২) সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান সম্পাদক—অঞ্জলি বসু

৩) প্রবন্ধ/নিবন্ধ সন্ন্যাসিনী গৌরীমা

—শ্রীমতী অনিতা কুমারী বসু

৪) অনান্য সাময়িক পত্র পত্রিকা সমূহ

শ্যামাপ্রসাদ কুমার

সিঁদুর রঙে উঠলো রেঙে পূর্ব আকাশের গায়
বলছে যেন দিনমণি, ‘‘আয়রে ছুটে আয়’’।
নূতন বছর নূতন সকাল নূতন বাঁচার আশ
হৃদমাঝারে নে-না ডেকে মিটতে আপন সাধ।
ঠাকুরের সে উদ্যানবাটী নয়তো তেমন দূর—
পা চালিয়ে গেলেই হল এই তো কাশীপুর।
দু-হাত তুলে ডাকছে ‘‘প্রভু’’ কোথায় আছিস ওরে!
সময় তো গো যায় যে চলে; থাকিস নে আর দূরে!!
আসছে ধেয়ে নানান কাল সময়-যুগের সাথে
কেমন করে বাঁচবি তোরা নোংরা মাখা হাতে!
তাই-তো এখন করবো রোপন এমন তরু বৃক্ষ—
‘‘কল্পতরু’’ বলবে যাকে—পরশ লওয়ায় লক্ষ্য।’’
ঠাকুর হলেন ‘কল্পতরু’ আজি এমন শুভদিনে
কৃপা পেলেন জনে জনে; নিলেন কাছে টেনে।
কোথায় কাল কোথায় আঁধার কোথায় হাহাকার
প্রেমের-সাগর প্রেম বিলালেন, জগৎ দেখলো চমৎকার!!
আজিও মোরা থাকি চেয়ে এই দিনটি স্মরে
গুণমণি আসবে আবার প্রেম বিলাবার তরে।
‘ঠাকুর’ হলেন ‘কল্পতরু’ করতে সবে পার
তাঁহার নামে জয়টি দিয়ে বলি, ‘‘রামকৃষ্ণ’’ সার।।

—০—

প্রচ্ছদ চিত্রটিতে ষ্টার থিয়েটারে নটী বিনোদিনী অভিনীত **শ্রী চৈতন্য** নাটকটি দেখার পর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে নটী বিনোদিনীর দিব্য সাক্ষাৎকারের চিত্রটি প্রকাশিত হয়েছে। শ্রী চৈতন্য নাটক দেখে মুগ্ধ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব নটী বিনোদিনী সহ সমস্ত সহঅভিনেত্রীদের আশীর্বাদ করছেন।

এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেব ছিলেন রামকৃষ(ময়। তিনি কঠোর ১৪বছর সিউড়ীতে তপস্যা করা পর শ্রীশ্রীরামকৃষ(আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর জীবনের প্রতিটি স্পন্দনে অনুরণিত হত শ্রীরামকৃষ(-সারদা প্রেমভাব, যার স্ফুরণ দেখা যায় তাঁর রচিত গানে, কবিতায়, প্রবন্ধে ও জীবনের প্রতিটি ছত্রে। এই ভাব সকলের কাছে পৌঁছে দিতেই তিনি প্রকাশ করতে শু(করেছিলেন এই ‘ভাবমুখে’ পত্রিকাটি।

চিত্রটির পরিমার্জিত রূপদান করেছেন নিতাই মুখার্জী। প্রচ্ছদ পরিকল্পনা করেছেন স্বামী সত্যপ্রকাশানন্দ ও অ(ণ অধিকারী।

শ্রী সুমন ভট্টাচার্য্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৪৮)

ব্রাহ্ম সমাজে

ইতিমধ্যে নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত শুরু করেছে, ব্রাহ্মসমাজের নিয়ম অনুযায়ী নরেন্দ্রনাথও নিরাকার ব্রহ্মের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তাই সে-ও ধ্যানে অনেক কাল অতিবাহিত করে। ধ্যানকেই নরেন্দ্র সেই ছেলেবেলা থেকেই ঈশ্বরলাভের একমাত্র উপায় বলে জেনেছে। সেই ছোটবেলা থেকে যখন চার-পাঁচ বছর বয়স তখন রামসীতা, মহাদেব প্রভৃতি মূর্তি বাজার থেকে কিনে এনে তাদের সামনে ধ্যানের ভানে চোখ বুজে নিস্পন্দ ভাবে বসে ধ্যান নরেন। ছোট নরেন শুনেছিল ধ্যান করতে করতে মুনিঋষিদের নাকি মাথায় জটা হয়, তাই সে ধ্যান করতে করতে মাঝে মাঝে চোখ খুলে দেখত তার জটা বেরিয়েছে কিনা, সেই ছেলেবেলাতেই নরেন একদিন হরি নামে এক প্রতিবেশী ছেলের সাথে সকলের অজ্ঞাতে বাড়ির নিভৃত এক প্রদেশে ঢুকে এতক্ষণ ধ্যানের ভানে বসেছিল, যে সকলে তাদের খুঁজতে চারদিকে ছুটল, ভাবল যে সে বোধ হয় কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে। পরে সেই ঘর ভেতর থেকে বন্ধ দেখে একজন ভেঙে প্রবেশ করে দেখল—নরেন সেখানে নিস্পন্দ হয়ে ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছে।

এই ধ্যান নরেন্দ্রনাথের নিত্যসঙ্গী, 'নরেন্দ্র ধ্যানসিদ্ধ'।

সময় পেলেই নরেন্দ্র ডুবে যায় ধ্যানের গভীরে। এই ধ্যানের মধ্যেই নরেন্দ্র খুঁজে পায় তার আপনার আমিকে।

(৪৯)

দেবেন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে

এমনই একদিন ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন নরেন্দ্রকে বলল—চল ভাই, আদি ব্রাহ্মসমাজের যিনি আচার্য তাঁর সঙ্গে দেখা করিগে।

—কি নাম তার ?

—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সেই কটি ছেলেকে কাছে ডেকে সাদরে বসালেন মহর্ষি। বললেন—প্রতিদিন ধ্যানাভ্যাস করবে। ঈশ্বরকে লাভ করতে হলে তাঁর ধ্যানের অভ্যাস করা দরকার।

এবার তাঁর চোখ পড়ল বিরল দর্শন যুবক নরেন্দ্রর দিকে।

—কি নাম তোমার ?

—আমার নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত।

—বাহ ! ভারী সুন্দর নাম।

তোমাতে যে যোগীর লক্ষণ সকল প্রকাশিত। একটু ধ্যানাভ্যাস করলেই যোগশাস্ত্র নির্দিষ্ট ফল সকল তুমি প্রত্যক্ষ করবে।

নরেন্দ্রনাথ বসে আছেন চুপ করে। ইংরাজী কলেজের ছাত্র, সাহেবদের—কাছে ফিলজফি পড়া, ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শোনা নরেন্দ্রনাথ, শুধু কি তাই ? কেশবচন্দ্রের 'ব্যাণ্ড অফ হোপ' এর সদস্য, ব্রাহ্মসমাজের সংগীত পরিচালনা করা নরেন্দ্রনাথ অভিনয়ও করেন কেশবচন্দ্র সেনের নাটকে। উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতশিল্পী। ভাল নাচেন। আবার অসাধারণ ব্যায়াম বীর, মুষ্ঠিযুদ্ধে প্রথম হয়ে রূপোর প্রজাপতি পুরস্কার পেলেন নরেন্দ্রনাথ।

নরেন্দ্রনাথ খোলস ছেড়ে বেরোলেন। যে প্রশ্নটি তাকে দিনরাত কুরে কুরে খাচ্ছে—তিষ্ঠোতে দিচ্ছে না তাকে—যে প্রশ্নটি নিজের মনে নিজেকেই সহস্রবার করেছেন নরেন্দ্রনাথ, আজ সেই প্রশ্নটি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে করলেন নরেন্দ্রনাথ, সরাসরি তার চোখের দিকে চেয়ে। কোনো সংকোচ নয়, কোন ইতস্ততঃ নয়।

—মহাশয় আপনি কি ঈশ্বর দেখেছেন ?

প্রশ্নটি শুনেই কেমন যেন স্তিমিত হয়ে গেলেন মহর্ষি, এ কেমন প্রশ্ন ? কি উত্তর দেবেন তিনি এই প্রশ্নের ? সত্যিই কি এই প্রশ্নের কোনো উত্তর তাঁর জানা আছে ?

এ প্রশ্নের উত্তর কে দিতে পারেন, তা তো মহর্ষির জানা। দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেব। যেদিন প্রথম তিনি রাণী রাসমণির জামাতা মথুরবাবুর সঙ্গে এসেছিলেন সেদিনই মহর্ষি জেনেছিলেন একমাত্র ইনিই ঈশ্বরদর্শন

করেছেন, জেনেছেন সেই ব্রহ্মকে।

মথুরবাবু এসেই বললেন—ইনি তোমায় দেখতে এসেছেন। ইনি ঈশ্বর ঈশ্বর করে পাগল। পরমহংসদেব বললেন—দেখি গা, তোমার গা।

মহর্ষি—গায়ের জামা তুললেন। মহর্ষির সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের সেই অবস্থাটি হল। সেই অবস্থাটি হলে তিনি কে কিরূপ লোক দেখতে পান। দেবেন্দ্রর অবস্থা দেখে হঠাৎই তিনি হি-হি করে হেসে উঠলেন। এ অবস্থায় তার পণ্ডিত-ফণ্ডিত তৃণ জ্ঞান হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ দেখলেন—যে দেবেন্দ্রর যোগ ভোগ দুই-ই আছে। অনেক ছেলেপুলে ছোট ছোট, ডাক্তার এসেছে। অত জ্ঞানী, তবু সংসার নিয়ে সর্বদা থাকতে হয়।

পরমহংসদেব মহর্ষিকে বললেন—তুমি কলির জনক। জনক এদিক ওদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি।' তুমি সংসারে থেকে ঈশ্বরে মন রেখেছো শুনে তোমায় দেখতে এসেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবেন্দ্রনাথের কাছে ঈশ্বরীয় কথা শুনতে চাইলেন। দেবেন্দ্রনাথ তখন বেদ থেকে কিছু শোনালেন। বললেন—এই জগৎ যেন একটি ঝাড়ের মতো, আর জীব হয়েছে—এক-একটি ঝাড়ের দীপ।

পরমহংসদেব ঠিক এমনটাই দেখেছিলেন ধ্যানের গভীরে পঞ্চবটীতে। তাই দেবেন্দ্রর কথার সাথে মিল খুঁজে পেলেন।

দেবেন্দ্র ব্যাখ্যা করে বললেন---এ জগৎ কে জানত?—ঈশ্বর মানুষ করেছেন, তাঁর মহিমা প্রকাশ করবার জন্য। ঝাড়ের আলো না থাকলে সব অন্ধকার, ঝাড় পর্যন্ত দেখা যায় না।

অনেক কথাবার্তার পর দেবেন্দ্র খুশি হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে বললেন—আপনাকে উৎসবে আসতে হবে।

পরমহংসদেব বললেন—সে ঈশ্বরের ইচ্ছা। আমার তো এই অবস্থা দেখেছ। কখন কি ভাবে তিনি রাখেন।

দেবেন্দ্রনাথ বললেন—না, আসতে হবে, তবে ধুতি আর উড়ানি পরে এসো—তোমাকে এলোমেলো দেখে কেউ কিছু বললে, আমার কষ্ট হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন—তা পারব না। আমি বাবু হতে পারব না।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথাশুনে দেবেন্দ্রনাথ, মথুরবাবু খুব হাসলেন।

তারপরদিনই মথুরবাবুর কাছে দেবেন্দ্রনাথ চিঠি পাঠালেন—পরমহংসদেবকে উৎসব দেখতে যেতে হবে না। অসভ্যতা হবে, গায়ে উড়ানি থাকবে না।

নরেন্দ্রনাথের প্রশ্নের উত্তর দেবেন্দ্রনাথের কাছে নেই।

তাই নিজেকে একটু গুছিয়ে নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ বললেন—তোমার যোগীর লক্ষণ। তুমি ধ্যান করলে শীঘ্রই ফল পাবে।

চোখ নামালেন নরেন্দ্রনাথ। তাঁর ঠোঁটের কোণায় ভেসে উঠল অদৃশ্য এক হাসি। বুঝেছেন নরেন্দ্র। তাঁর প্রশ্নের উত্তর নেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে।

কিন্তু একটুও হতাশ হলেন না নরেন্দ্রনাথ। তিনি খুঁজবেন। কখনো না কখনো তিনি নিশ্চয়ই দেখা পাবেন—এমন একজনের—যিনি ঈশ্বরকে দেখেছেন। একমাত্র সেই মানুষটিই তো তাকে বলে দিতে পারবেন কেমন করে পৌঁছানো যায় সেই ঈশ্বরের কাছে? কি সেই উপায়। যার সাহায্যে দর্শন করা যায় ঈশ্বরকে? জানা যায় তাকে! নরেন্দ্র খুঁজতে থাকেন, খুঁজতে থাকেন। খুঁজতে থাকেন।

(৫০)

সুরেন্দ্রর বাড়ীতে

"ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়। আমি যে তোদের ছেড়ে আর থাকতে পারি না।"—কুঠী বাড়ীর ছাদে উঠে আকুল হয়ে কেঁদেছিলেন পরমহংসদেব। দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী যে তপস্যা তিনি করেছেন—আজ তার ফল যে ছড়িয়ে দিতে চান তিনি। এতদিন যা যা করেছেন, পঞ্চবটীর ঐ নীরব, নিভৃত রাতে অনন্ত আকাশ হতে যে অস্ফুট আলোক রাশি ঝরে পড়েছে তাঁর বিস্তৃত বক্ষে, দধীচীর মত নিজেকে নিঃশেষ করে তিনি যে তা ধারণ করেছেন, সে কি তাঁর নিজের তরে? এ জগতে তাঁর যে কিছু পাবার নেই—তিনি যে এসেছেন, বারে বার আসেন তাঁর যা কিছু সব অকাতরে বিলিয়ে দিতে, তাই যে তাঁর ভক্তদের জন্য এমন ব্যাকুলতা। মা যেমন জানেন বাড়ীর

কোথায় কি আছে, ছোট চাবিটিরও সন্ধান আছে তার কাছে, তিনিও যে জগৎ-সংসারের মা, তিনি জানেন সব। তিনি জানেন ভক্তদের আগমনকাল—কে কখন এসে জুটবে, কলমীর দল যে সব, তিনি টানলেই আসতে হবে। তাঁর ডাকে না এসে উপায় কি ?

সুরেন্দ্রনাথ এসেছেন কিছুদিন হল। প্রথম দর্শনের দিন থেকেই কি যেন এক টান তিনি অনুভব করেন এই অদ্ভুত মানুষটির প্রতি।

সুরেন্দ্রর আসল নাম সুরেন্দ্রনাথ মিত্র। কলকাতার বাবুদের মতই বিলাসবহুল ছিল তাঁর পূর্বজীবন। ১৮৮০ নাগাদ, যখন তার বয়স তিরিশ, রামচন্দ্র দত্তের সঙ্গে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ সান্নিধ্যে এসে পড়লেন। তার পূর্বজীবনের সমস্ত পাপকার্য সত্ত্বেও শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে গ্রহণ করলেন ভালোবেসে। অবাক হলেন সুরেন্দ্র। এমনও হয়। যিনি নিজে পবিত্রতাস্বরূপ, তিনি এমন কুকর্ম করা একজনকে কেমন করে আদরে গ্রহণ করেন ! যতদিন যায়, ততই তিনি কাছে চলে আসেন শ্রীরামকৃষ্ণের, ততই ঠাকুর হয়ে ওঠেন তার প্রাণের ঠাকুর। একদিন সাহসে ভর করে সুরেন্দ্র তাকে বললেন—ঠাকুর, আপনাকে একদিন আমার বাড়ী যেতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে সম্মত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাবো।

১২৮৮ সালের হেমন্তের শেষভাগ, ইংরাজী ১৮৮১ সালের নভেম্বর মাস। নরেন্দ্রনাথের তখন আঠারো বছর। আঠারো বছরের দুঃসহ বয়স, নরেন্দ্রনাথ তৈরী হচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ.এ. পরীক্ষা দেবার জন্য। সুরেন্দ্রনাথ একদিন দেখা করলেন নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে। বললেন—নরেন, তোমাকে গান গাইতে হবে আমার বাড়ীতে।

নরেন গান গাইতে ভালোবাসেন। বললেন—বেশ তো। গাইব। সুরেন্দ্র খুশী হয়ে বললেন—বাহ্ ! ঐ দিন আমার বাড়ীতে দক্ষিণেশ্বর থেকে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আসবেন।

নরেন বললেন—বেশ তো, আশা করি তাঁকে গান শুনিয়ে আমিও আনন্দ পাবো।

নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা শুনেছেন জেনারেল অ্যাসেম্বব্লিজ ইনস্টিটিউশনে পড়ার সময়। অধ্যাপক উইলিয়াম হেষ্টি একদিন সাহিত্যের ক্লাস নিচ্ছিলেন। উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'দ্য এক্সকারশন' কবিতা পড়াচ্ছিলেন তিনি।

''So Familiarly
Do I perceive the manner another look
And presence, and so deeply do I feel
ter goodness, that not seldom in my walks
A momentary trance comes over me ;
And to myself I seem to muse on one
By Sorrow laid asleep or borne away,
A human being destined to awake
To human life, or something very near
To human life, when he shall vome again
For whom she suffered.''

—ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা থেকে পড়ছিলেন উইলিয়াম হেষ্টি সাহেব। উঠে দাঁড়ালেন নরেন্দ্র— Sir, can I ask you one question ?

হেষ্টি সাহেব বললেন— Yes, please.

–Sir, what is the meaning of trance.

–Ah, trance ?

'Trance'–কি তা বোঝানোর চেষ্টা করলেন হেষ্টি সাহেব। বললেন—Trance is a half conscious state characterized external stimuli, typically as uduced by hyponosis or entered a medium. Is it clear to you all ?

নরেন্দ্র বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ ছাড়াই উত্তর দিলেন—No, Sir. It's not clear to me.

হেষ্টি বললেন---Then you must go to Dakshineswar. I have heard there lives one Ramakrishna Paramhansa who after goes into the state if deeptrance.

'Trance' ব্যাপারটিকে ভাল ভাবে বুঝতে গেলে তোমাদের যেতে হবে দক্ষিণেশ্বরে। সেখানে শুনেছি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আছেন। শুনেছি তিনি নাকি মাঝে মাঝেই বাহ্যজ্ঞানহীন অবস্থায় থাকেন। তোমরা চাইলে সেখানে গিয়ে তাঁর অবস্থাটি স্বচক্ষে দেখে আসতে পারো। (ক্রমশঃ)

নারী প্রগতি ও স্বামী বিবেকানন্দ

ড. অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

হিন্দুধর্ম ও দর্শন শাস্ত্রানুসারে 'আত্মা' সর্বভূতে বিরাজমান। এই আত্মাকে বিশেষ নামে অভিহিত করা যায় না, বিশেষ কোন চিহ্নে চিহ্নিত করা যায় না। ছোট বড় ভালো-মন্দ, স্ত্রী-পুরুষ সকলের মধ্যেই বিরাজমান। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হয়েছে ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি। আত্মা সর্বত্র এক এবং সমান তার বিকার নেই। আত্মা আছে বলে সব কিছু আছে। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়; নাম ভেদে বহুরূপে আমরা তাকে দেখে থাকি। এক দেখাটাই জ্ঞান, বহুরূপে দেখলে অজ্ঞানতা প্রকাশ পায়। অনেকটা এইরকম যে একই লোক অনেক রূপ নাম নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনি যতই তা করুন না কেন প্রকৃতপক্ষে তিনি একই থেকে যান।

'আত্মা' নারী এবং 'পুরুষ' উভয়ের মধ্যে আছে তাহলে নারী-পুরুষের মধ্যে কোন মৌলিক বিভেদ থাকতে পারে না। হিন্দুদর্শন মান্যতা দেয় নারী-পুরুষ সর্বার্থে এক ও অভিন্ন। এজন্যেই আমরা বৈদিক যুগে দেখি নারী পুরুষ সমান মর্যাদার অধিকারী। সেই সময় নারীর অধিকার, নারী স্বাধীনতা ইত্যাদি প্রশ্ন উঠতো না। রাষ্ট্র-সমাজে পুরুষের যা প্রাপ্য তা নারীরও ছিল। পুরুষ বিদ্যাচর্চা, শাস্ত্রচর্চা, শস্ত্রচর্চা যেমন করছে পাশাপাশি নারীরাও বিদ্যা-শাস্ত্র-শস্ত্র চর্চাতে ব্যস্ত ছিল। বৈদিক যুগে নারী-পুরুষ তত্ত্বগত ভাবে নয় বাস্তবেও সমান মর্যাদা পেয়েছে। মৈত্রেয়ী, গার্গী, লোপামুদ্রা প্রমুখ নামের সঙ্গে সকলেই পরিচিত। তাঁদের লিখিত সূক্ত আমরা আবৃত্তি করে থাকি।

এখন প্রশ্ন নারীদের এই যে সমাদর, সমানাধিকার করে থেকে ক্ষুণ্ণ হলো ? কিভাবে নারী উঁচু আসন থেকে নীচে নামানো হলো। শ্রুতির পর স্মৃতিতেও দেখি স্বয়ং মনু বলছেন, 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।' অর্থাৎ যেখানে নারীদের পূজো করা হয় সেখানে দেবতারা প্রীত হন। তাঁর আরোও বক্তব্য হলো কন্যাপেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ; বাংলা করলে দাঁড়ায় মেয়েদের যত্ন সহকারে পালন করা উচিত এবং শিক্ষা দেওয়া উচিত। মনু যে প্রশ্নগুলো তুলেছেন তা থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না সমাজে নারীদের অনাদর দেখা দিয়েছে। নারীদের এই উপেক্ষা-অনাদর যা থেকে জন্ম নেয় নারীদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা, বাল্যবিবাহ বহুবিবাহ, বয়স্ক-পুরুষের তরুণীভাষা, বালবিধবা, বালবিধবার ওপর নির্যাতন, সতীদাহ প্রথা এই হলো নারীদের বাস্তব অবস্থা।

ঊনিশ শতকের বাংলার সামাজিক ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাওয়া যাবে, নারীদের প্রতি এই অবিচার এক শ্রেণির মানুষকে ব্যথিত করেছিল, তারা এর বিরুদ্ধে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করেছেন। রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রাতঃস্মরণীয় এই মনীষীরা নারীদের উপর অত্যাচার অবিচার শোষণ বন্ধ করার জন্য নিজেদের সঁপে দিয়েছিলেন। শাস্ত্র ঘেঁটে প্রমাণ করেছিলেন সতীদাহ প্রথা কিংবা বিধবা-বিবাহ কোনটায় শাস্ত্র সম্মত কিংবা বিরোধী নয়। যুক্তিতর্কের মধ্য দিয়ে তাদের বক্তব্যকে তুলে ধরতে কম প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়নি। ধীরে ধীরে সমাজ নারীদের প্রতি যে কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয়। স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী হয়ে নারীদের প্রতি অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে মুখর হয়েছিলেন। ভারতীয়দের অধঃ পতনের কারণ হিসাবে নারী জাতির প্রতি অসাম্য-অন্যায়-অবিচার অত্যাচারকে চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁর অভিমত ছিল বিশ্ব ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে যে সব জাতি বড় হয়েছে তারা নারীদের সম্মান করে প্রতিষ্ঠা দিয়েই সমৃদ্ধির মুখ দেখেছে। নারী শক্তির প্রতিমূর্তি। নারীশক্তির অসম্মান জনিত কারণেই আমাদের জগতের অধঃপতন। ভারতবর্ষ হলো সীতা সাবিত্রীর দেশ, পুণ্যক্ষেত্র ভারতে মেয়েদের যেমন চরিত্র, সেবাভাব, স্নেহ দয়া, তুষ্টি ও ভক্তি দেখা যায়, পৃথিবীর কোথাও তেমন দেখা যায় না। স্বামীজী বিশ্বাস করতেন যে জাতি সীতা চরিত্র সৃষ্টি করেছে নারীজাতির উপর সেই জাতির শ্রদ্ধা অতুলনীয়। তিনি ব্যথাহত হয়ে পড়েন, যখন দেখেন সেই জাতি নারীদের অবমাননা করছে। 'বাল্যবিবাহ' বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন—অল্প বয়সে বিয়ে হওয়ার দরুণ অসময়ে সন্তান ধারণ করতে

হয়, যার ফল বালিকা-বধূর মৃত্যু, সন্তানও হয় অপুষ্টির শিকার। বাঙলার ঘরে ঘরে যে বিধবা তার পিছনে রয়েছে এই বাল্যবিবাহ। এই বিয়েতে স্বামীজীর ক্ষোভ এতখানি যে, তিনি জানান—'শিশুর বর যারা জোটায় তাদের তিনি খুন করতে পারেন।' একবার স্বামী বিবেকানন্দকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, বিধবাবিবাহ ঠিক কিনা? স্বামীজী বলেছিলেন, আমি কি বিধবা? তিনি পুরুষ এ বিষয়ে তার বলার কোন অধিকারই নেই। বিধবারা নিজেদের ভাগ্য নিজেরা নির্ধারণ করবে। বিধবাদের শিক্ষিত করে তোলা দরকার। পুরুষদের এব্যাপারে নাক গলানোর প্রয়োজন নেই। পুরুষরা ভগবান নয়, যে মেয়েদের সমস্যা সমাধান করবে? বিধবা কিংবা নারীদের প্রতি কর্তৃত্ব করা চলবে না।

'জগতের কল্যাণ স্ত্রী-জাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই, এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে; নারীদের শিক্ষিত করে তুললেই নারী জাগরণ সম্ভব।' স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন প্রতিটি নারীর মধ্যেই জগন্মাতার প্রতিমূর্তি বিরাজমান। স্বামীজীর গুরু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পথের ধারে এক বারনারীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলেছিলেন, 'মা, তুমি এক রূপে জগৎ-প্রপঞ্চ হয়েছ আর একরূপে তুমি আজ এখানে দাঁড়িয়ে আছ।'

ভারতবাসীর পশুত্ব লাভের কারণ নারীজাতির অবমাননা। ভারতীয়দের অভ্যুত্থান সম্ভবপর হবে যখন নারী জাতির অভ্যুদয় ঘটবে। পাখীকে আকাশে বিচরণ করতে গেলে দুটো ডানার প্রয়োজন, একটি ডানায় উড়া সম্ভবপর হয় না। সমাজও পাখীর মতো, নারী-পুরুষের সমানতা না থাকলে সমাজের যথাযথ বিকাশ সম্ভব নয়। ভারতের আদর্শ সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী। ত্যাগ ও সেবা ভারতের আদর্শ। সমগ্র জাতির মুক্তির জন্য নারীর মুক্তি দরকার। ভারতের সার্বিক মঙ্গল সাধন ছিল স্বামীজীর কাম্য। চাঁছা ছোলা ভাষায় তিনি বলেছিলেন, ভারতীয় বলে লজ্জিত হওয়ার কিছু নেই, ধর্মে বিশ্বাস, তেজের অধিকারী আশাবাদী এবং গৌরবান্বিত ভাব রাখতে হবে। অন্যদের কাছ থেকে আমাদের কিছু নেওয়ার যেমন আছে, কিন্তু এ জগতকে অনেক বেশি দেওয়ার জিনিস আমাদের রয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শকে পাথেয় করে যে নারীরা জীবন গড়তে চায়, তারা অবশ্যই সাফল্যের সিঁড়িতে চড়তে পারবেন। ❑

হরিবোল

পুষ্পিতা ঘোষ

স্বয়ং
বিষ্ণু দাঁড়িয়ে আছেন
চতুর্ভুজে।
নেপথ্যে
ধরিত্রী আর্তনাদে
কোলাহলময়....
'বাঁচাও-বাঁচাও'—আর সহ্য হয় না.....
একই সঙ্গে ভেসে আসে
অসুরের অট্টহাস।
পরম ভক্ত নারদ করেন প্রার্থনা...
"প্রভু কৃপা করো—
তোমার সৃষ্টিকে রক্ষা করো...
কি উপায় শ্রীহরি...?
—চাই হরিভক্তিময়
ভক্তের আকুলিত আহ্বান।"
তাই—ভক্ত হৃদয়ের
অমৃত মন্থনে আসেন
জগৎ সংসারে শচী—নন্দন।
ধরাতে নামে ধারার বন্যা....
সাত সাগরে মেশে
নামের গঙ্গাজল।
ভগবৎ সত্তার চরম পরীক্ষায়—
যবন থেকে অচণ্ডাল বলে—
"হরিবোল—হরিবোল।"
কৃপা—কৃপা।
এক নামেতেই
ধুয়ে যায় সব কলুষতা।
এখন
ঘরে ঘরে আলোক—সজ্জা
আকাশে—বাতাসে মুখরতা। ❑

ছাত্র ও শিক্ষক যেন ফুল ও ফুলবাগানের মালি

ড. দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য

বর্তমান যুগে জন-জীবনে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে তা বিদ্যালয়ের শান্ত জীবনধারাকে সবিশেষ জটিল করে তুলেছে। বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্ নানা প্রকারের উপায় উদ্ভাবন করেছেন। কারও মতে ছাত্রকে স্বাধীনভাবে চলতে দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। রুশো এই মতবাদের প্রবর্তক।

আবার কোন কোন শিক্ষাবিদের মতে এই স্বাধীন-শৃঙ্খলা নীতি (Free-discipline theory) ছাত্রের যথাযথ বিকাশের পক্ষে উপযুক্ত নয়। প্রথম থেকেই ছাত্রদের একটি নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে এনে বিশেষ একটি আদর্শের দিকে পরিচালিত করা উচিত।

এই শ্রেণীর শিক্ষাবিদ্দের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন যে, দুষ্টামি ও অন্যায় করা ছাত্রদের স্বভাব ধর্ম। সুতরাং কঠোর শাস্তির সাহায্যে ছাত্রদের নিয়ম পালনে বাধ্য করনো প্রয়োজন। এদের নীতি হল 'spare the rod, spoil the child' অর্থাৎ তাড়না না করলে শিশুকে মানুষ করা যাবে না।

কেউ কেউ আরও মনে করেন যে ছাত্রদের ব্যবহার ও চরিত্র ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে প্রাইজ বা পুরস্কার প্রথারও প্রয়োজন আছে। প্রাইজের লোভে ছাত্ররা নিজেদের সাধ্যের অতিরিক্ত কার্য করতে উৎসাহ বোধ করবে।

আর একদল আছেন যারা মনে করেন বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও পাণ্ডিত্যই সবিশেষ প্রয়োজনীয়।

রবীন্দ্রনাথের মতে কি সমাজ জীবনে, কি বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার সমস্যা পরিবেশের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত। উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে ছাত্রদের মনকে শৃঙ্খলা রক্ষার সচেতন করা যেতে পারে। বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ 'জীবন-স্মৃতিতে' এইভাবে উল্লেখ করেছেন।

"এই ইস্কুলে উৎপাত কিছুই ছিল না, তবু হাজার হইলেও ইহা ইস্কুল। ইহার ঘরগুলো নির্মম। ইহার দেয়ালগুলো পাহারাওয়ালার মতো—ইহার মধ্যে বাড়ির ভাব কিছুই নাই, ইহা খোপওয়ালা একটা বড়ো বাক্স। কোথাও কোনো সজ্জা নাই, ছবি নাই, রঙ নাই, ছেলেদের হৃদয়কে আকর্ষণ করিবার লেশমাত্র চেষ্টা নাই। ছেলেদের যে ভালোমন্দ লাগা বলিয়া একটা খুব মস্ত জিনিস আছে, বিদ্যালয় হইতে সে-চিন্তা একেবারে নিঃশেষে নির্বাসিত। সেই জন্য বিদ্যালয়ের দেউড়ি পার হইয়া তাহার সংকীর্ণ আঙিনার মধ্যে পা দিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সমস্ত মন বিমর্ষ হইয়া যাইত।" (জীবন স্মৃতি)

রবীন্দ্রনাথ এই পরিবেশ সৃষ্টির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন এতে কোন সন্দেহ নেই। শান্তিনিকেতনে চারিদিকের গাছপালা, ফুল পাখীর আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে! এই পরিবেশের অভাবহেতু আমাদের অধিকাংশ বিদ্যালয়ই জেলখানা বা পাগলাগারদের আবহাওয়া সৃষ্টি করে থাকে।

আবার বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষার ভার যাদের উপর ন্যস্ত তারা ভুলে যান যে ছেলেমানুষি ছেলে বয়সের ধর্ম। এই ছেলেমানুষি বন্ধ করবার জন্য যারা শাস্তি দিতে চান, তাদের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, তারা ছাত্রদের নৈতিক ক্ষতি সাধন করে থাকেন। ছেলেদের স্বভাব-ধর্ম অনুযায়ী তাদের স্বাধীনতা দিতে হবে। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন তাহলে শৃঙ্খলা রক্ষার সমস্যার জটিলতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে। ছোটো ছেলেকে যদি ছোটো হইতে দেওয়া যায়—সে যদি খেলিতে পায়, দৌড়িতে পায়, কৌতুহল মিটাইতে পারে, তাহা হইলেই সে সহজ হয়। কিন্তু যদি মনে কর, উহাকে বাহির হইতে দিব না, খেলায় বাধা দিব, ঠাণ্ডা করিয়া বসাইয়া রাখিব, তাহা হইলে অত্যন্ত দুরূহ সমস্যার সৃষ্টি করা হয়। তাহা হইলে, ছেলে মানুষ ছেলে মানুষির দ্বারা নিজের যে-ভার নিজে অনায়সেই বহন করে সেই ভার বাহন কর্তার উপরে পড়ে।" (জীবনস্মৃতি)

মন্তেসরীও এই পরিবেশ সৃষ্টির উপর সবিশেষ জোর দিয়েছেন। মন্তেসরী বিদ্যালয়কে বলেছেন 'Mother's house' বা 'মাতৃগৃহ'। অর্থাৎ বিদ্যালয়ে যথাসম্ভব বাড়ীর আবহাওয়া সৃষ্টি করতে চেয়েছেন।

অনেক শিক্ষক ছাত্রদের সামান্য অপরাধকেও অমার্জনীয় মনে করেন। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান চাঞ্চল্য শিশুদের স্বভাবধর্ম এবং জীবনের গতিবেগই তাদের সমস্ত প্রকার পাপ থেকে পরিত্রাণ করে। মানুষ ভুল করবেই, কিন্তু ভুলের মধ্যে দিয়েই মানুষ সত্যের সন্ধান লাভ করে। বিষয়টি নিজের

জীবনের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ এই ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

"আমার নিজের একটি স্কুল আছে এবং সেখানে ছাত্রেরা নানা প্রকার অপরাধ করিয়া থাকে—কারণ, অপরাধ করা ছাত্রদের এবং ক্ষমা না করা শিক্ষকদের ধর্ম। যদি আমাদের কেহ তাহাদের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ ও ভীত হইয়া বিদ্যালয়ের অমঙ্গল আশঙ্কায় অসহিষ্ণু হন ও তাহাদিগকে সদ্যই কঠিন শাস্তি দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠেন, তখন আমার নিজের ছাত্র-অবস্থার সমস্ত পাপ সারি সারি দাঁড়াইয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া হাসিতে থাকে।

আমি বেশ বুঝিতে পারি, ছেলেদের অপরাধকে আমরা বড়োদের মাপ-কাঠিতে মাপিয়া থাকি, ভুলিয়া যাই যে ছোটো ছেলেরা নির্ঝরের মতো বেগে চলে; সে জলে দোষ যদি স্পর্শ করে তবে হতাশ হইবার কারণ নাই, কেন না সচলতার মধ্যে সকল দোষের সহজ প্রতিকার আছে; বেগ যেখানে থামিয়াছে সেইখানেই বিপদ, সেইখানেই সাবধান হওয়া চাই। এই জন্য শিক্ষকদের অপরাধকে যত ভয় করিতে হয় ছাত্রদের তত নহে।" (জীবন স্মৃতি)

স্বভাবধর্ম অনুযায়ী শিশুরা কখনই বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের মধ্যে আপনাকে আটকে রাখতে ভালবাসে না। এইরূপ আটকে রাখার চেষ্টা করলে বিদ্যালয় তাদের নিকট জেলখানায় পরিণত হয়। সুতরাং বিদ্যালয়ের মুক্ত পরিবেশে ছাত্রদের চিত্তের প্রক্ষোভ যেমন মুক্তিলাভ করে, তেমনি ডিসিপ্লিন সমস্যার সমাধানও সহজে হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ এই নীতি হতেই শান্তিনিকেতনের মুক্ত পরিবেশে স্কুল স্থাপন করে শিশুদের স্বাধীনতা দান করলেন। ছেলেরা বিশ্ব প্রকৃতির অত্যন্ত কাছের। আরাম-কেদারায় তারা আরাম চায় না, সুযোগ পেলেই গাছের ডালে তারা চায় ছুটি। বিরাট প্রকৃতির নাড়ীতে নাড়ীতে প্রথম প্রাণের বেগ নিগূঢ়ভাবে চঞ্চল। শিশুর প্রাণে সেই বেগ গতি সঞ্চার করে। কৃত্রিমতার জাল থেকে মুক্তি পাবার জন্যে তারা ছটফট করে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন 'বিশ্বপ্রাণের স্পন্দন লাগতে দাও ছেলেদের দেহে মনে, শহরের বোবা কালা মরা দেয়ালগুলোর বাইরে।" (শিক্ষা)

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষায় শিক্ষকদের ব্যক্তিগত প্রভাবের মূল্য অপরিসীম। প্রকৃত শিক্ষক ছাত্রজীবনের মূল বিষয়টি ধরতে পারেন। এই কারণে সকলের পক্ষে এই গুণ লাভ করা সহজ হয় না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ছাত্রদের ভার তাহারাই লইতে পারেন যাহারা নিজের চেয়ে বয়সে অল্প, জ্ঞানে অপ্রবীণ ও ক্ষমতায় দুর্বলকে সহজে শ্রদ্ধা করিতে পারেন। তাহারা জানেন, 'শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা, যাহারা ছাত্রদেরকেও মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না।' (শিক্ষা)

ঠিকভাবে বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা করতে হলে প্রথমেই শিক্ষকদের নিজেদের আচরণ, বাক্য চরিত্র ও বিদ্যাবত্তা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। যে শিক্ষক নিজের উপদেশ ও আদর্শের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারেন, একটি বিশেষ চারিত্রিক দৃঢ়তার দ্বারা নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন, ছাত্রদের শিক্ষক, চালক ও বন্ধু হিসাবে নিজেকে উপস্থাপন করতে পারেন,—ছাত্ররা নির্বিচারে তাঁর আদেশ মেনে চলে। তিনি সহজেই ছাত্রদের শ্রদ্ধার অধিকারী হন। গুরুশিষ্যের প্রকৃত সম্পর্কের উপরেই বিদ্যালয়ের আদর্শ নির্ভরশীল। আমাদের মনে রাখতে হবে—ছাত্ররা গুরুকে ভক্তি করতে পারলে বেঁচে যায়। 'অধ্যাপকদের কাছ হইতে একটুমাত্রও যদি ইহারা খাঁটি স্নেহ পায় তবে তাঁর কাছে হৃদয় উৎসর্গ করিয়া দিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে।' উপযুক্ত শিক্ষকের প্রভাব কেবলমাত্র বিদ্যালয় জীবনেই নয়, পরবর্তী কালেও ছাত্রদেরকে মহৎ জীবনের দিকে পরিচালিত করে।

কেন শিক্ষকেরা শাস্তি প্রদানে উৎসুক—রবীন্দ্রনাথ এই মনোবৃত্তি সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। শিক্ষকেরা যখন নিজেদের কর্তব্য পালনে অক্ষম হন, তখন তারা ছাত্রদের সামান্য অপরাধে শাস্তির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন। শাস্তি দেওয়া শিক্ষকদের চরিত্রে দুর্বলতার পরিচায়ক। 'ছেলেদের কঠিন দণ্ড ও চরম দণ্ড দেবার দৃষ্টান্ত যেখানে দেখা যায় প্রায়ই সেখানে মূলত শিক্ষকেরাই দায়ী।' তারা দুর্বলমনা বলেই কঠোরতা দ্বারা নিজের কর্তব্যকে সহজ করতে চান।

রাষ্ট্রতন্ত্রেই হোক আর শিক্ষাতন্ত্রেই হোক, কঠোর শাসন নীতি শাসয়িতারই অযোগ্যতার প্রমাণ। শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা। ক্ষমা যেখানে ক্ষীণ সেখানে শক্তিরই ক্ষীণতা।' (শিক্ষা)

"অনেক সময়ে শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ শাসননীতি কঠোরভাবে প্রয়োগ করবার জন্য ফতোয়া জারি করেন। এতে আপাত

দৃষ্টিতে কিছু লাভ হতে পারে, ছাত্ররা ভয় করতে শেখে, কিন্তু তাদের চরিত্রের কোনরূপ স্থায়ী উন্নতি হয় না। এতে যে কেবলমাত্র ছাত্রদের ক্ষতি হয় তা নয়, এতে অধ্যাপকদেরও ক্ষতি ঘটায়। তাই এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সাবধানবাণী এই যে,—"ছাত্রদিগকে কড়া শাসনের জালে যাঁরা মাথা হইতে পা পর্যন্ত বাঁধিয়া ফেলিতে চান তাঁরা অধ্যাপকদের যে কত বড়ো ক্ষতি করিতেছেন সেটা যেন ভাবিয়া দেখেন।" (শিক্ষা)

ইহার উত্তরে অনেকে হয়তো বলবেন তবে কি ছেলেরা যা খুশি তাই করবে, আর সমস্ত সহ্য করতে হবে। এতে কি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে না? ছাত্রদের প্রকৃতি ও মনস্তত্ত্ব যাদের জানা তারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন স্বাধীনতা দিলে ছেলেরা যা কিছু তা করে না। বরং ঠিক পথেই চলে, যদি তাদের সঙ্গে ঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়। জেলের কয়েদি, অপরাধীদের শাসন করতে হয়, ফৌজের সেপাইদের কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা না মানলে শাস্তি পেতে হয়, কিন্তু স্কুলের ছোট ছোট বালক বালিকারা জেলের কয়েদি বা ফৌজের সেপাই এর ব্যবহার পাবার উপযুক্ত নয়।

শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য, বিদ্যালয়ের কার্য যথাযথ করবার জন্য প্রাইজ বা পুরস্কার দানের প্রথা বহু বিদ্যালয়ে প্রচলিত। শিক্ষাবিদগণ মনে করেন প্রাইজের লোভে ছাত্ররা সাধ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রম করবে এবং এক সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের সৃষ্টি হবে। অনেকে মনে করেন পুরস্কার দান প্রথা মনোবিজ্ঞান সম্মত।

থর্ণডাইকের শিক্ষার নিয়মের মধ্যে 'অভিজ্ঞতার ফল' একটি বিশেষ তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুযায়ী আমাদের উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়াজনিত অভিজ্ঞতা যদি আনন্দময় ও তৃপ্তিদায়ক হয়, তাহা হলে যে প্রচেষ্টাগুলি মধুর অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে, সেগুলি আমরা মনে রাখি এবং তাদের পুনরাবৃত্তির চেষ্টা করে থাকি। সুতরাং প্রাইজের লোভে ছাত্রেরা ঠিকভাবে পড়াশুনা করবে এবং আচরণেও শৃঙ্খলা রক্ষা করবে। এই হিসাবে শাস্তি দেওয়া পুরস্কারের বিপরীত পদ্ধতি। শাস্তির ভয়ে ছাত্রেরা অসঙ্গত কার্য থেকে বিরত থাকবে।

উপরে উল্লিখিত পুরস্কার তত্ত্বের বিরোধী বহু শিক্ষাবিদ আছেন যারা মনে করেন বিদ্যালয়ে পুরস্কার প্রথা প্রচলন করলে ছাত্রদের মধ্যে যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের সৃষ্টি হয় তা প্রকৃত শিক্ষার বিরোধী। আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা ছাত্রদের মধ্যে প্রতিযোগিতাপূর্ণ মনোভাবের পরিবর্তে সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব সৃষ্টি করে। পুরস্কারের লোভে নানা অসদুপায় অবলম্বনে ছাত্রেরা প্ররোচিত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ নিজে পুরস্কার প্রথার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করছেন।

রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে যখন শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন, তখন সেখানে কোনরূপ 'প্রাইজ' দেবার ব্যবস্থা রাখেন নাই। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রদের কখনো 'প্রাইজ' দেওয়ার রীতি ছিল না... পড়াশুনার 'ভালো' ছেলেদের পুরস্কৃত করা হইত না। কবি একখানি পত্রে (১৪ সেপ্টেম্বর ১৯০৭) মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিতেছেন, 'ভালো ছেলেকে তার ভালত্বের জন্য পুরস্কার দেওয়াটা কি শ্রেয়? সংসারে পুরস্কার হতে বঞ্চিত হওয়াতেই যথার্থ ভালর পরীক্ষা ও পরিচয়; 'আমি ভাল' একথা কেউ যেন প্রাইজ দেখিয়ে প্রচার করার অবকাশ না পায়।" (রবীন্দ্র-জীবনী, ৪র্থ খণ্ড)

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন ছেলেরা 'ভালো ছেলে' হবার জন্য কোন পৃথক পুরস্কার পাবে না; তারা যে ভালো —সাধারণের এই প্রশংসামূলক মনোভাবেই তারা নিজেদের পুরস্কৃত ভাববে। সমাজে প্রকৃত পণ্ডিত ব্যক্তি আর্থিক সঙ্গতি লাভ না করতে পারলেও, প্রকৃত পাণ্ডিত্য লাভকেই যোগ্য পুরস্কার বলে মনে করবে। অন্যেরা যাহা পারে নাই, আমি পেরেছি এই মনোভাবই হল যোগ্যতার পুরস্কার। প্রকৃত জ্ঞানলাভ অর্থাৎ কর্তব্যকর্মে 'ভালো হওয়া'ই ভালো ছেলের একমাত্র পুরস্কার হওয়া উচিত।

অনেকে মনে করতে পারেন বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এইরূপ মনোভাব সৃষ্টি করা খুব কঠিন। কারণ বর্তমান সমাজ প্রতিযোগিতা মূলক এবং সমাজের জীবন যুদ্ধে যোগ্যতমেরাই জয়লাভ করবে এই নীতি স্বীকৃত। রবীন্দ্রনাথ যে নীতির কথা বলেছেন তা একমাত্র সম্ভব হতে পারে যদি সমাজের গঠন সহযোগিতামূলক হয়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সহযোগিতা ও সমবায়ের উপর সবিশেষ জোর প্রদান করে। সামাজিক মঙ্গলের অনুকূলে ব্যক্তিগত লোভ ও স্বার্থকে বিসর্জন দিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের নীতি সামাজিক সহযোগিতার সত্যনীতির উপর ভিত্তি করে রচিত। ❑

হরিপুরুষ শ্রীশ্রীজগবন্ধু সুন্দর

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীবৈকুণ্ঠ

চম্পটি ঠাকুর ছিলেন বন্ধুসুন্দরের খুবই অন্তরঙ্গ প্রিয়জন। স্থানান্তর গমনাগমনের সময় প্রায়শঃই তিনি থাকতেন প্রভুর সঙ্গী হিসাবে। একবার বৃন্দাবন যাওয়ার সময় রাত্রিবেলা প্রভুকে তিনি নিয়ে এসেছেন হাওড়া স্টেশনে। প্রভু তাঁকে হঠাৎ বললেন বৃন্দাবনের টিকিট কিনে আনতে। অকিঞ্চন বৈষ্ণবের কাছে পয়সা কড়ি থাকার কথা নয়। অতুলচন্দ্রের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়। প্রভুকে তিনি বলিলেন, "প্রভু, এত রাত্রে টাকা পাবো কোথায়?"

প্রভু বলেন, "ব্রজের পাথেয় গৌর ভক্তই জোগাবে।"

ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে উদভ্রান্তের মত এদিক ওদিক দৌড়ে চম্পটি ঠাকুর আসেন বিডন্ স্ট্রীটে। দেখেন, তিলক কণ্ঠীধারী একটি যুবক ঝাঁপ ফেলে তার দোকান বন্ধ করছে, অতুল চন্দ্র তাঁকে সরাসরি এসে জিজ্ঞেস করলেন, "মশাই, আপনি কি একজন গৌরভক্ত? যুবকটি বলল, "আজ্ঞে- এ অধম গৌরভক্তির কিছু না বুঝলেও লোকে আমাকে গৌরভক্তই ভাবে বটে।"

আর কাল বিলম্ব না করে চম্পটি তাকে সব কথা খুলে বলেন এবং জানান যে, বৃন্দাবনের গাড়ী ভাড়া বাবদ পঞ্চাশ টাকা বারো আনা তাঁর প্রয়োজন। যুবকটি বলে, "অত টাকা আমার দোকানের তহবিলে নেই, তবে যা আছে আপনাকে আমি দিতে পারি।" দোকানটি আবার খুলে টাকা পয়সা গুণে দেখা যায় তহবিলে পঞ্চাশ টাকা বারো আনাই আছে। বিস্মৃত যুবক প্রভু জগবন্ধুর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে ভক্তি ভরে সেই টাকা অতুলচন্দ্রের হাতে তুলে দিলেন।

বৃন্দাবনের পাথেয় প্রদানকারী গৌরভক্ত সেই যুবকটির নাম মুকুন্দ ঘোষ। ইনি কীর্তন গান ও মৃদঙ্গ বাদনে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। পরবর্তীকালে নাম প্রচার আন্দোলনে ইনি প্রভুর অন্যতম পরিকররূপে পরিগণিত হয়েছিলেন।

১৯২৮ সালের কথা। সে সময় চুঁচড়ায় ছিলেন পরম বৈষ্ণব গৌরভক্ত শ্রীঅন্নদাচরণ দত্ত। তাঁর মধ্যে সময়ে সময়ে বিদেহী মহাত্মাদের আবেশ, হতো এবং তাঁদের কাছ থেকে বহু সময়ে নানান নির্দেশাদি পাওয়া যেত। একদিন ভাবাবিষ্ট অবস্থায় অন্নদাবাবু বললেন, "জীব উদ্ধারের জন্য পূর্ব বঙ্গে অবতার কল্প এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে, তাঁর নাম জগবন্ধু।

অন্নদাচরণের কাছে বহু বিশিষ্ট মানুষের সমাগম ছিল। অমৃতবাজার পত্রিকার মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ প্রমুখ ভক্তেরা ছিলেন অন্যতম, অন্নদাচরণের কাছে ঐ বার্তা পেয়ে অনুসন্ধান করে তাঁরা প্রভু জগবন্ধু সম্বন্ধে জানতে পারেন এবং তাঁদের মুখে মুখে প্রভুর নাম কলকাতার ভক্ত সমাজেও প্রচারিত হয় তখন থেকেই।

অলৌকিক যোগ বিভূতিকে প্রভু জগবন্ধু অতি তুচ্ছ জ্ঞান করতেন। তবু সময় সময় স্ব ইচ্ছায় ঐ শক্তি তিনি নিজেও প্রকাশ করতেন। ভক্তদের দ্বারা হরিনাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বন্ধুসুন্দর কখনো কখনো শবের অভিনয় করতেন। ভক্তেরা হরিবোলে মাতোয়ারা হয়ে তাঁকে কাঁধে তুলে রাজপথে পরিভ্রমণ করতেন। সে সময় তাঁর ওজন কখনো কখনো তুলোর মত হাল্কা মনে হতো। আবার কখনো বা তিনি এত ভারী হয়ে উঠতেন যে তাঁকে কাঁধ থেকে নামিয়ে রাখতে বাধ্য হতেন তাঁরা। বন্ধুসুন্দর কথাচ্ছলে মাঝে মাঝে বলতেন, "এ দেহকে ইচ্ছে মত হাল্কাও করা যায়, ভারীও করা যায়। ছোটও করা যায়, বড়ও করা যায়, কালোও করা যায়, ধলাও করা যায়।"

রাম বাগানের ভক্তেরা জগবন্ধু সুন্দরকে মাঝে মাঝে ডুলি পাল্কীতে বসিয়ে গঙ্গাস্নানে নিয়ে যেতেন। একদিন পথে পুলিশ তাঁদের গতি রোধ করে ডুলিতে 'কে আছে' দেখতে চাইলে দেখা গেল প্রভু তার মধ্যে নেই। আবার পুলিশ চলে যেতেই দেখা যায় প্রভু যথা স্থানেই আছেন।

প্রভু যখন বৃন্দাবন প্রভৃতি দূর দেশে থাকতেন তখন তাঁর ভক্তেরা এখানে তাঁর ছবির সামনে ভোগ নিবেদন করতেন। ভক্তেরা কে কবে কী বস্তু দিয়ে ভোগ দিয়েছেন সেই বিবরণ ভক্তদের জানিয়ে পরে প্রভু প্রমাণ দিতেন যে ছবির মধ্যে থেকেও তিনি সবই লক্ষ্য করেন। আবার কোন্ কোন্ ভক্ত তাঁর অবর্তমানে মনপ্রাণ ঢেলে কীর্তন করেছেন সেকথাও তিনি পরে বলে দিতেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলতেন বিদেশ থেকে অমুক পাখীরূপে অমুক চালে বসে তিনি কীর্তন শুনেছেন এবং যে ভক্ত সেই পাখীটি সত্যই লক্ষ্য করেছেন। তাঁর দ্বারা ঐ ঘটনার সত্যতা প্রমাণ হয়ে যেত।

প্রভু জগবন্ধু তাঁর লীলাবিস্তার কল্পে পাবনা,

ময়মনসিংহ, ঢাকা, কলকাতা, চন্দননগর, নবদ্বীপ বৃন্দাবন, দিল্লী, পাঞ্জাব, রাওয়ালপিণ্ডি, রাজপুতানা, প্রভৃতি নানাস্থানে ভ্রমণের শেষে ফরিদপুরের উপকণ্ঠে গোয়ালচামট গ্রামে ১৩০৬ সালের ২৩শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে স্থাপিত শ্রীঅঙ্গন ধামে স্থায়ী আসন গ্রহণ করেন। এখানে গবাক্ষহীন অন্ধকার একটি কুটীরের মধ্যে অসূর্য্যম্পশ্য এবং মহামৌনী অবস্থায় তিনি ১৩০৯ সালের আষাঢ় মাস থেকে ১৩২৫ সালের ১লা মাঘ পর্যন্ত মোট ১৬ বছর ৮ মাস কাল অতিবাহিত করেন। এর মধ্যে ১৩১০ সালের একবার মাত্র কয়েক দিনের জন্য মৌনী প্রভু দু'একটি স্থানে গমন করেন। কুটীরে অবস্থান কালে মাঝে তিনি আবশ্যক জিনিস পত্রের ফর্দ অথবা কোনো উপদেশাদি লিখে মন্দির থেকে বাইরে ফেলে দিতেন। ১৩১৪ সালের পর থেকে তাঁকে আর ঐ কাজ করতে দেখা যায় নি। প্রভুর ভোগ নিবেদন করা হতো বন্ধ দরজার সামনে। দরজ ভিতর থেকে খুলে সর্বাঙ্গ বস্ত্রে ঢেকে প্রভু সেই ভোগ ভিতরে নিয়ে যেতেন। সেসময় তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করার সাহস হতো না কারও। এ ব্যবস্থাও চলে ১৩১৯ সাল পর্যন্ত।

ঐ বছর অগ্রহায়ণ মাসের ৩ থেকে ১৪ তারিখ পর্যন্ত প্রভু বারো দিন বদ্ধ ঘরে সম্পূর্ণ অনাহারে ছিলেন। বন্ধুসুন্দর জীবিত অবস্থায় আছেন কিনা ভক্তদের মনে এই সন্দেহ দৃঢ় হওয়ায় ১৫ই অগ্রহায়ণ একদিকের বেড়ার এক অংশ খুলে দরজা খুললে প্রভুর অপূর্ব দিব্য জ্যোতির্ময় দিগম্বর জীবন্ত দেহ দর্শনে সকলে ধন্য হন। ভক্তদের প্রার্থনায় সেদিন তিনি সামান্য ভোগও গ্রহণ করেন।

১৩২২ সালে মহামৌন অবস্থার বারোবছর উত্তীর্ণ হলে বন্ধু সুন্দরের শয্যার পরিবর্তন করা হয়। সেই উপলক্ষ্যে ঐ বছরের ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে প্রতিদিন অন্তঃত দুই হাজার ভক্ত প্রভুর দিব্যদর্শন লাভ করেন। তাঁদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান ব্রাহ্ম -খৃষ্টান, প্রভৃতি কোন জাতিধর্মের বিচার ছিল না।

বন্ধু সুন্দরের বাসমন্দিরটিও জীর্ণ হওয়ায় ঐ সময়ের মধ্যে আদি মন্দিরের পূর্ব দিকে নতুন মন্দির নির্মাণ হয়। ১৩২৫ সালের ১লা মাঘ প্রভুকে নিয়ে আসা হয় এই নবনির্মিত মন্দিরে এবং ঐ সময় পুরানো মন্দিরটির সংস্কার সাধন করা হয়।

প্রভু জগবন্ধুর মহামৌন ভঙ্গ হয় ১৩২৫ সালের ১৭ই ফাল্গুন। তখন তাঁর শিশুভাবের দশা। মৌন হওয়ার বহু দিন আগেই ভাবস্থ অবস্থায় তিনি একবার লিখেছিলেন —"আমার বয়ঃ পাঁচ বর্ষ। আমাকে শিশু কহে।" ১৩০৬ সালে প্রভুজগবন্ধু রচিত 'চন্দ্রপাত' গ্রন্থে ' পঞ্চমবর্ষীয় শিশু উদ্ধারণে ভাবে" এই বিশেষ বাণীটিও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মৌনভঙ্গের পর ঐ বাণীতে তিনি সত্যই মূর্ত হয়েছিলেন। শিশুভাবের এমন পূর্ণ প্রকাশ সত্যিই বিরল। সেসময় ভক্ত সেবকদের কাঁধে দোলায় চেপে বন্ধুসুন্দর মাঝে মাঝে স্থানান্তরে গমনাগমন করতে খুবই পছন্দ করতেন। শিশুভাবে অবস্থানকালে এজগতের কোনো জিনিষেই তাঁর লক্ষ্য থাকতো না। দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকতো অন্যদিকে। কোথায় কোন্ রাজ্যে কোন্ মহাভাবে যে তিনি তন্ময় হয়ে থাকতেন তা বোঝা যেত না। কখনও বা অদৃশ্য কারও সঙ্গে কথা কইতেন। আহার করতেন একটা পাখীর চেয়েও কম।

১৩২৬ সনের ভাদ্র মাসে প্রভু বন্ধু একদিন মন্দিরে শুয়ে আছেন। তাঁর পদপ্রান্তে বসে আছেন ভক্ত সেবক সীতানাথ। ভক্ত বাঞ্ছাকল্পতরু বন্ধু সুন্দর তাঁকে হঠাৎই প্রশ্ন করেন, "তুই কী চাস?"

সীতানাথ বলেন, "মহা উদ্ধারণ মহাশক্তি দেখতে চাই।" সেই মুহূর্তে অভাবনীয় একটি ঘটনা ঘটে। বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে সীতানাথ দেখেন, দিব্য জ্যোতির্ময়ী দশভুজা ভগবতী দেবী স্মিত হাস্য মুখে স্বয়ং দাঁড়িয়ে আছেন প্রভুর পাশেই। অল্পক্ষণের মধ্যেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন সীতানাথ আবার জ্ঞান হলে দেখেন, শিশু ভাবেই প্রভু শুয়ে আছেন নীরবে। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হয়ে সজ্ঞানে "জয় জগবন্ধু" নাম জপ করতে করতে সীতানাথ দেহত্যাগ করেন।

১৩২৬ সালের শেষভাগে প্রভু জগবন্ধুর জন্য একটি হাতে টানা গাড়ী নিয়ে আসা হয় কলকাতা থেকে। সেবক বাহিত হয়ে ঐ গাড়ীটিতে ভ্রমণ করতে প্রভু খুবই পছন্দ করতেন। ঐ গাড়ীতে বসা অবস্থায় তাঁর একটি আলোক চিত্রও একদিন তোলা তোলা হয়।

১৩২৮ সালের ১৭ই ভাদ্র বৈকালিক ভ্রমণের জন্য তাঁকে চৌকি থেকে নামানোর সময় ভক্তদের অসাবধানতায়

প্রভু বন্ধু মাটিতে পড়ে গেলে তাঁর দক্ষিণ উরুতে আঘাত লাগে। এই ঘটনা থেকেই বন্ধু সুন্দরের মহাসমাধির সুত্রপাত হয়। যথাযোগ্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করে তাঁকে সুস্থ করে তোলার দুরূহ প্রচেষ্টা চলতে থাকে। ২৯শে ভাদ্র তারিখে তাঁর আহার গ্রহণে অনিচ্ছা ও তার সঙ্গে ঢেকুর তোলার এক নতুন উপসর্গ দেখা যায়।

প্রভু জগবন্ধুর অসুস্থতা, শয়ন নিদ্রা, ভক্তের হাত থেকে নীচে পড়ে যাওয়া, এ সবকিছুরই গভীর একটা তাৎপর্য আছে। যোগমায়ার প্রভাবে ভ্রান্ত হয়ে যাঁকে শিশুরূপে পরম নিশ্চিন্তে নিদ্রাভিভূত দেখা যায়, আসলে তিনি কি সত্যিই নিদ্রিত থাকেন? এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেই একবার বলেছিলেন, "সব দেবদেবী নিদ্রিত। কেবল জেগে আছি আমি। আমি চিরকাল জেগে থাকি। আমি ঘুমালে পলকে প্রলয় হয়ে যাবে।"

সেবক সীতানাথকে শয্যায় শায়িত অবস্থায় একদিন তিনি বলেছিলেন, "হরি পুরুষ কি শুয়ে থাকেন? সব জায়গায় হেঁটে বেড়ান। এখনও হাঁটছেন।" সেই কথার প্রমাণ তিনি নিজেই দিয়েছিলেন মহাসমাধির ঠিক আগে। জেলাস্কুলে ছাত্রাবস্থায় প্রভুবন্ধুর শিক্ষক ছিলেন দক্ষিণানাগ। তাঁর সহধর্মিনী বন্ধুসুন্দরের পরমভক্ত ছিলেন। ২৯শে ভাদ্র সন্ধ্যেবেলায় প্রভু যখন অচল অবস্থায় শ্রীঅঙ্গনে অবস্থান করছেন, তখন ঐ ভক্তিমতী রমণীর বাড়ীতে উজ্জ্বল দিগম্বর মূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে প্রভু তাঁকে বলেন, "আমি ইংরেজ মুল্লুকে চললেম, আমি যে তাদেরই যীশু তাই জানাতে। আর শ্রীক্ষেত্রে চললাম, আমি যে তাদেরই জগন্নাথ তাই জানাতে। মুসলমান রাজ্যে চললাম, আমি যে তাদেরই মদিনা মক্কা, তাই জানাতে। তোমাদের মদনমোহন, তাদের মদিনা মক্কা, একই কথা।" আবার বলেন—"কেউ হরিনাম করে না। তাই আমি ব্রহ্মাণ্ডময় একাই কৃষ্ণ কীর্তন করতে চললেম। এ সময় আমার মৃতবৎ অবস্থা হবে। আমার দেহ সম্পূর্ণ সাতদিন রেখে অবিরাম হরিনাম করতে বলবে।"

এই কথা বলা শেষ হলে প্রভুকে আর সেখানে দেখা যায়নি।

প্রভু জগবন্ধু বলেছিলেন—"আমাকে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অণুপরমাণুর মধ্যে ঘুরে বেড়াতে হবে। আমি পুরুষ, আমি না গেলে কেউ কিছু করতে পারবে না। তাই আমাকে যেতে হবে। তোরা তো আমাকে ঘরে রাখতে পারবি না।" শেষ পর্যন্ত সত্যিই তাঁকে আর ঘরে রাখা গেল না। ১৩২৮ সালের ১লা আশ্বিন, ইংরাজী ১৯২১ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর ভাদ্র পূর্ণিমা, শনিবার বেলা ১২টা ১০ মিনিটে প্রভু জগবন্ধুর অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত হলো। "হরি পুরুষ জগবন্ধু মহা উদ্ধারণ"—ভক্তদের অবিরাম এই সংকীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মহাসমাধিমগ্ন হলেন। বিভিন্ন গ্রাম ও শহর থেকে আবালবৃদ্ধবনিতা আসতে লাগলো শেষ বারের মত প্রভুর দুর্লভ দর্শন লাভের আশায়। জনতার স্রোত প্রতিহত করা অসম্ভব দেখে শ্রীঅঙ্গণের চারিদিকের বেড়া খুলে দেওয়া হলো। ১০ই আশ্বিন পর্যন্ত প্রতিদিন এইভাবে দিগ্বিদিক থেকে এলেন ভক্তেরা। তার মধ্যে একদিন, ৫ই আশ্বিন, প্রভুর শ্রীমুখ থেকে অস্ফুট একটি শব্দ শোনা যায়। ঐ সময় তাঁর দিব্য দেহটি ঘর্মাক্ত হয়ে ওঠে।

মহাসমাধির অন্তিম ব্যবস্থাপনা শুরু হয় ১৩ই আশ্বিন। প্রভুর আসন স্থানে চার হাত পরিমাণ দৈর্ঘ্য ও চার হাত গভীর একটি গর্ত খুঁড়ে সেখানে কাঠের মেঝে সহ ঐ মাপের কাঠের একটি কুঠীর নির্মাণ করা হয়। প্রভুর দিব্য দেহটি একটি কাঠের সিংহাসনে বসিয়ে স্নানাভিষেক, পূজার্চনা ও ভোগ নিবেদনের পর ঐ উপবিষ্ট অবস্থাতেই তাঁকে ঐ গর্তে রেখে কাঠের ছাদ দিয়ে গর্তটি আচ্ছাদিত করা হয়; এরপর তার ওপরে ত্রিস্তর মাটি লেপন করে অন্তিম সমাধি কার্য সম্পন্ন হয়। শ্রীঅঙ্গনে সেদিন পালিত হয় এক মহোৎসব। অগণিত ভক্তরা প্রসাদ খান সেখানে। ১লা আশ্বিন থেকে দ্বাদশ দিনের অখণ্ড মহানাম সংকীর্তনের ছেদ পড়ে ঐ ১৩ই আশ্বিনে।

সমাধির সঙ্গে সঙ্গে প্রভু জগবন্ধুর লীলারও অবসান হয়েছে, এমন ভ্রান্ত ধারণা হয়তো কারও মনে থাকতে পারে। কিন্তু প্রভু এই প্রসঙ্গে এক সময় নিজেই বলেছিলেন —"আমার লীলা সহস্র বছর চলবে।"

প্রভু আরও বলেছেন, "আমার এ দেহ অপ্রাকৃত, দেশ ও কালের অধীন নয়।"

"চারটি মহাদেশে সমানভাবে ধর্ম সংস্থাপন করবো, তবে জানবি জগবন্ধুর লীলা শেষ হবে।"

"যখন সময় হবে, তখন প্রকাশ হবে। আমার মহাপ্রকাশে সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে।"

বন্ধু সুন্দরের ঐ বাণীগুলি অনুসরণ করলে বোঝা যায়, প্রকৃতির অনুকূলে তাঁর লীলা আজও চলছে অবিচ্ছিন্নভাবে। একটি গাছ যেমন রোজই কিছুটা বাড়ে। কিন্তু সেই বৃদ্ধি তখুনি ধরা পড়ে না, ধরা পড়ে বেশ কিছুদিন পরে। সেই রকম প্রভু জগবন্ধুর মহাউদ্ধারণ লীলা আমাদের বোধগোচর হবে আগামী দিনে। তাঁর শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী কখনও মিথ্যা হয়নি, হতে পারেও না। প্রভু জগবন্ধুর মহাপ্রকাশ তাই হবেই এবং সেই মহাপ্রকাশ হবে মহাপ্রলয়ের সন্ধিক্ষণে হরিনাম তথা মহানাম সংকীর্তনের মাধ্যমে, প্রভু বলেছেন, "তোমরা হরিনাম করলেই আমার মহা উদ্ধারণ ব্রত শেষ হবে এবং আমার উদ্দেশ্য সমাধিত হবে। এই নাম গ্রহণে সবার সমান অধিকার। ইহাতে জাতিকুল বিচার নাই।"

"হরিনাম শব্দ শুধুমাত্র হরিঠাকুরের নাম নহে। গুরু-গৌরাঙ্গ-গোপী, রাধা-শ্যাম, সব মিলিয়া এক হরিনাম। হরিবোল বললে সবই বলা হয়, হরিনাম মহাউদ্ধারণ মন্ত্র যাহাতে সমস্ত জীবজন্তু, স্থাবর জঙ্গম শুনতে পায় তাই করো। সকলকেই হরিনাম শুনাইও। ছোট বড় বাছিও না।"

কলিযুগের মহতী বিনষ্টি ও মহাপ্রলয়ের ইঙ্গিত তিনি দিয়ে গেছেন বারবার। তাঁর নানান উপদেশ, রচনা ও গানের মধ্যে দিয়ে তিনি সৃষ্টির আসন্ন ধ্বংসের এক ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন। বলেছেন—"সম্মুখে মহাপ্রলয়, যা সত্যযুগের আগমনী জানিয়ে দিচ্ছে। রক্ষা—হরিনাম। আমার একান্ত শরণাগত ভক্ত ভিন্ন এই সৃষ্টিতে রক্ষা পাওয়া দায়। আমার সান্নিধ্যে এলে পাপ, ত্রিতাপ, মায়া মোহ থাকতে পারে না। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র পুরুষ আমি, আর সব প্রকৃতি, দ্বিতীয় পুরুষ নাই।"

ভক্তবৎসল প্রভু, আসন্ন দুর্দিনের কথা চিন্তা করে তাঁর আশ্রিতজনকে জানিয়েছেন, "তোদের যদি মনে হয় কোনো বিপদ আসছে, তাহলে আমার নাম স্মরণ করে একটি তুলসীপত্র জলে ফেলে দিস। তাহলেই আমি জানতে পারবো।"

মহাপ্রলয়ের সন্ধিক্ষণে তাঁর মহাপ্রকাশের অবশ্যম্ভাবী সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়ে প্রভু জগবন্ধু বলেছেন—"যুগাবতার ছাড়াও শ্রীভগবান ধরাধামে আসতে পারেন। ধরাধামে অবতীর্ণ হওয়া তাঁহার নিজের ইচ্ছা। যখন আসবার প্রয়োজন হয় তখনই আসেন। তিনি যুগাবতারে যে শক্তি নিয়ে আসেন, তাহা অপেক্ষা অধিক শক্তি নিয়ে এসে মহাউদ্ধারণ কার্য্য করেন। তাঁহার আগমনবার্তা তিনি নিজে জানালে কিংবা সেই শক্তি প্রকাশ করলে তবেই জানতে পারা যায়।"

জগবন্ধুসুন্দর যে মহানাম কীর্তনের কথা বলেছেন ফরিদপুরের শ্রীঅঙ্গনে সেই কীর্তন যজ্ঞের সূচনা হয় তাঁর দেহ রক্ষার কিছুদিনের মধ্যেই। ১৩২৮ সালের ২রা কার্তিক ভক্তপ্রবর শ্রীমহেন্দ্রজীর নেতৃত্বে মন্দির বারান্দায় প্রভু রচিত 'চন্দ্রপাত' এর অন্তর্গত।

"হরিপুরুষ জগবন্ধু মহাউদ্ধারণ।
চারিহস্ত চন্দ্রপুত্র হা কীটপতন।।
প্রভু প্রভু হে, অনন্তানন্তময়।"

এই গানটি নানা সুর তান ও লয়ে কীর্তনের মাধ্যমে শুরু হয় সেই মহানাম যজ্ঞ। অকৃত্রিম ভক্তি রসে প্লাবিত ভক্তদের মহাউৎসাহে পরিচালিত সেই কীর্তন যজ্ঞ অবিরামভাবে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর চলার পর আসে এক ভয়ঙ্কর দুর্দিন। সত্যদ্রষ্টা প্রভু সেই দিনটির কথা বহু পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করে ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "দেখ, সময়ে এমন সব লোক আমার কাছে আসবে, তোরা দেখে অবাক হয়ে যাবি।" তারা ভুবন মঙ্গল হরিনামের জন্য জীবন উৎসর্গ করবে। মহাউদ্ধারণের জন্য তারা কামান বন্দুকের মুখে বুক পেতে দেবে।"

পূর্ব পাকিস্থান (অধুনা বাংলাদেশ) কে ঘিরে তখন শুরু হয়েছে পাক ভারতের যুদ্ধ। ১৩৭৮ সালের ৭ই বৈশাখ, সেই অভিশপ্ত দিনে, পাক সৈন্য ফরিদপুর শহরে প্রবেশ করে শ্রীঅঙ্গনে এসে সেখানে হরিনাম যজ্ঞে কীর্তনরত আটজন ভক্ত ব্রহ্মচারীকে গুলি করে হত্যা করে। গোলাগুলি বর্ষণের পর পশ্বাধম সৈন্যরা শ্রীমন্দির ও বিগ্রহাদির সমূহ ক্ষতি করে চলে যায়। পরে আর একদিন এসে মন্দিরে ডিনামাইট বিস্ফোরণ করে তারা ক্ষান্ত হয়।

ইতিমধ্যে তাদের প্রশয় ও সাহচর্যে স্থানীয় দুষ্কৃতিরাও অঙ্গনের বহুমূল্য-সম্পত্তি, অমূল্য গ্রন্থরাজি, প্রভুর ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রী, নানান চিত্রপট ও ফটো ইত্যাদি সব লুণ্ঠন ও নষ্ট করে। ঠাকুরের কৃপা পাকসৈন্যের অত্যাচারের আশঙ্কা করে ভক্তেরা আগের দিন অর্থাৎ ৬ই বৈশাখ শ্রীমন্দিরস্থিত

অষ্টধাতুর শ্রীবিগ্রহ মধ্যে স্থিত প্রভুর চিন্ময় অস্থিদেহ খানি সংগ্রহ করে অন্যত্র সরিয়ে রাখেন এবং ১১ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে কলিকাতার মহা উদ্ধারণ মঠে স্থানান্তরিত করেন। পরে ১৩৮৫ সালের ২রা কার্তিক ঐ শ্রীদেহ আবার ফরিদপুরের মঠে আনীত হয়। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমন্দিরেরও সংস্কার সাধিত হয় এবং প্রভুবন্ধুর একটি শ্রীমূর্তিও স্থাপন করা হয়।

১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর বাবরী মসজিদের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের দুষ্কৃতিরা সেখানকার বিভিন্ন হিন্দু মঠ মন্দির ধ্বংসে লিপ্ত হলে ভক্তরা প্রভুর সেই চিন্ময় অস্থি দেহ ফরিদপুরের শ্রীধাম অঙ্গন থেকে এপার বাংলায় নিয়ে আসেন। পরে কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী ঘুর্ণির পুতুলপট্টির কাছে একটি মন্দিরে সেই বিগ্রহ স্থাপন করে পূজার্চনার সূচনা করা হয়।

————————————

গ্রন্থ সহায়তা ঃ 'বন্ধুবার্তা' — শ্রী মহেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ

স্বামী বরেশ্বরানন্দ

আন্তরিক ইচ্ছা থাকলে ও সময় হলে, পাওয়া যায় সদগুরুর সন্ধান।
আবার অযাচিত ভাবে গুরুকৃপা লাভে, ধন্য হয় সাধক জীবন।।
গুরু এবং ইষ্ট এক জেনে করতে হয়, একাগ্র ভাবে সাধন ভজন।
গুরুকৃপা লাভ হতে পারে তখনই, আন্তরিক যদি হয় মন।।
হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে, যদি কখনও আসে আলো।
দপ্ করে আলোকিত হয় ঘর, একসাথে দূর হয় সব কালো।।
অনেক সময় ঈশ্বর কৃপা আপনা থেকে আসতে পারে জীবনে।
যদি সাধকের সুকৃতি ও সংস্কার ঢাকা থাকে অজ্ঞান আবরণে।।
মনে পড়ে শিষ্য একলব্যের একনিষ্ঠা ও গুরুভক্তির কথা।
আচার্য্য দ্রোণাচার্যের মূর্তি গড়ে গোপনে শেখেন অস্ত্রের নিপুণতা।।
ঈশ্বরের কৃপা গুরুর মাধ্যমে, নেমে আসে শিষ্যের জীবনে।
জীবন হয় সার্থক তখন, গুরুর নির্দেশে মন্ত্র জপে সে একমনে।।
সংসারে মানুষের অনেক দুঃখ-কষ্ট, আসে অএনক বাধা—বিঘ্ন।
একমাত্র গুরুর কৃপায় শিষ্য হতে পারে এ সকল তেকে উত্তীর্ণ।।
অনেক সময় সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি হয় না আধ্যাত্মিকতার ফল।
নিষ্ঠা সহকারে গুরুর আদেশ পালন করলেই জীবন হয় সফল।।
গুরুকেও ঘাটতে হয় অনেক, করতে হয় জপ—ধ্যান, সাধন ভজন।
গুরু ইচ্ছ করলেই করতে পারেন, শিষ্যের সংসার বন্ধন মোচন।।
গুরুদেব যকন স্থূলদেহ রাখেন, তখন ইষ্টের সাথে যান মিশে।
গুরু ইষ্টে এক হয়ে তখন, শিষ্যের অন্তরে লীলা করেন এসে।।
একাগ্র ভাবে ইষ্টমন্ত্র জপতে জপতে যখন শিষ্যের আসে শেষ দিন।
তখন গুরু এসে শিষ্যকে নিয়ে যান, ইষ্ট দেবতা যেথায় আসীন।।
এমনি ভাবে চলতে থাকে, এই গুরু শিষ্যের মধুর মিলন খেলা।
জগৎ প্রভু শ্রীভগবান মর্তধামে এই ভাবেই করেন তাঁর লীলা।।

অজিত চক্রবর্তী

বর্তমান আলোচনার সূচনায় আমরা দেখেছি, মা বলছেন ঠাকুর এবার তাঁকে রেখে গেছেন জগতে মাতৃভাব বিকাশের জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণ 'যুগাবতার' যুগের কি সমস্যা, যুগের কি প্রয়োজন তিনি জানতেন এবং তিনি ভবিষ্যতদ্রষ্টা, তাই তিনি জানতেন সেই দিন আসছে—বড় দুর্যোগের সেই দিন যেদিন ঘরে ঘরে মা থাকবেন কিন্তু প্রকৃত অর্থে মা থাকবেন না কি? প্রথম 'মা' অবশ্যই গর্ভধারিণী। কিন্তু আজ সভ্যতার তথাকথিত গতিপথে সমাজ, অর্থনীতি, মানসিকতার দ্রুত রূপান্তরের পরিপেক্ষিতে নিছক জন্মদাত্রীর ভূমিকা ভিন্ন আধুনিক নারী যেন জন্মদাত্রীর অন্যত্র রূপে নিজেকে বোধ রাখতে পক্ষপাতিত্ব নয়। সেই অন্যত্র রূপটি কে: সেরূপ গর্ভধারিণীর সঙ্গে আত্মবিলীয় জননীর। সেই সমন্বয়ের রূপটি হলেন 'মা' মায়ের স্বপ্নরূপ এবং বস্তুরূপ। যিনি সন্তান ছাড়া কিছু জানেন না তাঁর অন্যকোন জগৎ নেই, জীবন নেই। তাঁর চিন্তা, চেতনা, স্বপ্ন জাগরণ, তাঁর জীবন জগৎ জুড়ে শুধুই সন্তান। সন্তানের স্বার্থে স্বামীকেও অস্বীকার করতে পারেন সেই নারী—নারী হয়ে উঠেছেন 'মা'—ঘনীভূত রূপে মাতৃসত্ত্বা। সেই সর্বংস্বহা আত্মবিলীয় মাতৃরূপ শুধু সন্তান ভিন্ন যাঁর চোখে আর কোন স্বপ্ন নেই, যাঁর জীবনে আর কোন আকর্ষণ নেই, ভারতবর্ষের চেতনায় ছিল সেই জননীর রূপ। কিন্তু সেই জননী ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছেন ভারতবর্ষ থেকে। শুধু ভারতবর্ষ কেন, পৃথিবী থেকেই। শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন—এই যুগের সবচেয়ে বড় সমস্যা হবে—এই মাতৃহীনতার সমস্যা। সেই জন্য নতুন করে মায়েদের মধ্যে আবার 'মা' কে জাগাতে, মায়েদের মধ্যে মাতৃত্বকে পূর্ণভাবে বিকশিত করতে তিনি পৃথিবীতে শ্রীশ্রীমাকে রেখে গেলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে যে অপূর্ব মাতৃত্বের বিকাশ ঘটেছিল, তার অন্তরালে ছিল ব্রহ্ম বিজ্ঞানে তাঁর প্রতিষ্ঠা। কখনো জ্ঞানে, কখনো প্রেমে, কখনো সেবায় সেইভাবে বিকীর্ণ করেছেন তিনি। এমন সমদর্শিতা, এমন সর্বগ্রাসী মাতৃস্নেহ কোন নারীর মধ্যে আমরা এ যাবৎ দেখিনি। দেখিনি এমন করে কোন দেবীকে আত্মপরিচয় দিতে, 'আমি পাতানো মা নই, কথার মা নই, সত্য জননী। ধুলাকাদা মেখে কত সন্তান ছুটে আসছে—তাদের কোন দোষ ত্রুটি তিনি দেখছেন না, ধুলো ঝেড়ে কাদা ধুয়ে কোলে তুলে নিচ্ছেন। তাঁর স্নেহের দৃষ্টিতে ঠাকুরের সন্তান শ্রীমৎ সারদানন্দজীকে ও ডাকাত আমজাদের মধ্যে ভেদ রেখাটিও লুপ্ত করেছেন। এ যে তাঁরই দৃষ্টি তাঁর দায়, তাঁকেই সেই দায় বহন করতে হবে। তিনি খতিয়ে দেখেননি কে অন্তরঙ্গ আর কে বহিরঙ্গ, তাঁর নির্বিচারে গ্রহণ দেখে ঠাকুরও পর্যন্ত অবাক হয়ে গেছেন। যে বিষ তাঁরা নিজেরা হজম করতে পারছেন না, মা নীলকণ্ঠ হয়ে তা গ্রহণ করছেন। সারদা মায়ের এই শ্রীচরণ চিহ্ন দেখেই আমাদের মন সহসা উদ্বেলিত করে তোলে। এই শ্রীপদেই রয়েছে সকল সুখ, সকল শান্তি। যা একটি মানুষ চাই। সকল রিপুর মোড়কে আমরা খুবই অসহায়—তাইতো কি আমাদের প্রয়োজন তাহাই আজ ভুলে গেছি। কি করলে আমরা পেতে পারি এক টুকরো শান্তি, এক টুকরো সুখ। শুধুই চেয়ে যায় অশান্তির তোরণকে কেন্দ্র করে। কিন্তু মায়ের এই পদছবিকে দেখলে আর কি মনে হয়—মা এটা চাই, ওটা চাই বলে—তখন শুধুই হবে চেয়ে থাকা (দৃষ্টি)—তাও এই শ্রীচরণ—যেখানে রয়েছে চির শান্তির নীড়।

আমরা ঘটনা প্রসঙ্গে জানি এই শ্রীচরণেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন ষোড়শী পূজার রাতে ষোড়শী জ্ঞানে পূজা করে নিজে জপের মালা উৎসর্গ করেছিলেন শুধু তাই নয় ভক্তির সমর্পণে প্রণাম নিবেদন করে উৎসর্গীকৃত করেছিলেন নিজেকে। ঠাকুরের এই পূজার পদ্ধতিতে আমাদের কাছে মাতৃ সত্তার পূর্ণ বিকাশ 'সারদা মা' রূপে জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠলেন আমাদেরই সম্মুখে আর আমরা পেলাম মাকে সম্মুখে। বাস্তবিকই দেখতে পায় আমাদের চিরাচরিত সংসারের মধ্যে নারীকে পূর্ণ মর্যদা সহযোগে মাতৃত্বের উন্মেষ ঘটালেন ঠাকুর স্বয়ং নিজ হাতে, নিজ দায়িত্ব সহকারে। ভোগবতী থেকে ভগবতী রূপে —জাগতিক থেকে আধ্যাত্মিক পথে জাগরণ ঠাকুরই দেখালেন—এক অপূর্ব সন্বয়কে কেন্দ্র করে।

যেখানে মানবীর সত্ত্বা রূপান্তরিত হচ্ছে ভগবতীর রূপে, যেখানে মায়ের সঙ্গে যোগ হয়ে ওঠে সন্তানের। এই সম্পর্ক অতীব বাৎসল্য রসের ধারায় আজ সিক্ত।

মাতৃত্বের এই বিকাশকে কেন্দ্র করে ভাবীকালে সকলেই

পেয়ে উঠলেন মায়ের আশ্রয়। কে নেই সেই সম্পর্কের বেড়াজালে। এ যেন মায়ের কোলকেই আমরা পেলাম মা ডাকার সুযোগে।

বেলা আন্দাজ দশটা। ভক্তশ্রেষ্ঠ নাগ মহাশয় আসিয়াছেন—শ্রীমার দর্শনে। তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীমাকে সংবাদ দিলে তিনি প্রসাদ হাতে ভক্তের জন্য সিঁড়ির নিকট পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিয়া অপেক্ষা করিতে থাকেন। এদিকে নাগ মহাশয় শ্রীমার বাটীর সদর দরজা হইতে "মহামায়ী, মহামায়ী" শব্দ করিতে করিতে সাষ্টাঙ্গে অগ্রসর হইতে থাকিলেন—সমস্ত সিঁড়িটিও সেই ভাবে উঠিলেন। উপরে পৌঁছিলে শ্রীমা "এস বাবা, এস" বলিলে তিনি "মহামায়ী, মহামায়ী" বলিয়া মাথা নুঁড়িয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীমা ছাদের সিঁড়ির প্রথম ধাপটিতে বসিয়া তাঁহাকে উঠিতে বলিলে তিনি নতজানু হইলেন—সর্বাঙ্গ কাঁপিতেছে, নয়নদ্বয় হইতে ধারার পর ধারা নির্গত হইয়া গণ্ডযুগল বহিয়া পড়িতেছে। শ্রীমা বলিলেন, "এস, ঠাকুরের প্রসাদ পাও।" তিনি বলিলেন, "মহামায়ীর প্রসাদ।" শ্রীমা নিজের জিহ্বায় একটুকু ঠেকাইয়া তিনি বালকের ন্যায় খাইতে লাগিলেন। গণ্ডদ্বয় প্লাবিত হইতে থাকিল। প্রসাদ খাওয়াইয়া শ্রীমা জল এক ঢোক করিয়া মুখে দিতে থাকিলেন আর তিনি খাইতে থাকিলেন। এইপ্রকারে প্রসাদ খাওয়াইবার পর শ্রীমা হাত ধুইয়া আসিয়া দক্ষিণ হস্ত তাঁহার মস্তকে স্পর্শ করাইয়া আশীর্বাদ করিলে তিনি "মহামায়ী, মহামায়ী" কহিতে কহিতে বরার পাছু হটিয়া অবতরণ করিলেন। আর শ্রীমা যতক্ষণ তাঁহাকে দেখা যায়, ততক্ষণ অনিমেষনয়নে দেখিতে লাগিলেন।—এ এক অপার্থিব দৃশ্য।

দক্ষিণেশ্বরে নহবতের একতলার ছোট, আটকোণা, স্বল্প উচ্চতার ঘরে শ্রীমায়ের আবাসস্থল ছিল। ঘরটিতে ঢুকতে গিয়ে মাথা ঠুকে গিয়ে একদিন শ্রীমায়ের মাথায় কেটে গিয়েছিল। অপরিসর ঘরটিতে রান্না, থাকা, খাওয়া সবরকম কাজই শ্রীমাকে করতে হত। ঘরটিতে জিনিসপত্র রাখার জন্য উপরে সব শিকে ঝোলানো ছিল। লোকচক্ষুর অন্তরালে নিভৃত রাতে (রাত তিনটের সময়) ঘুম থেকে উঠে শৌচ ও স্নানাদি সেরে গভীর সাধনায় মগ্ন হয়ে থাকতেন। চাঁদের দিকে তাকিয়ে জানিয়েছিলেন এক অশ্রুতপূর্ব প্রার্থনা—'চাঁদেও কলঙ্ক আছে—আমার মনে যেন কোন দাগ না থাকে।' পূজা, জপ, ধ্যান এতে প্রায় দেড়ঘন্টা কেটে যেত। তারপর দোতলার সিঁড়ির নীচে রান্না করতে বসতেন। ঠাকুরের জন্য রান্নার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তদের আগমন সংবাদ পেয়ে তৎক্ষণাৎ সেই ভক্তদের জন্যও বিশেষ ধরণের রান্না করতে হত শ্রীমাকে। নরেন বা মাতা চন্দ্রমণিদেবীর সেবা ও পরবর্তীকালে ঠাকুরের কাছে আসা শিষ্য ও ভক্তদের জন্য বিভিন্ন আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি গভীর সাধনা জপ ধ্যান—আধ্যাত্মিক চর্চার মধ্যে দিয়ে এক আদর্শ জীবনের দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন। লক্ষ্মীদিদির সঙ্গে মায়ের ভজন সঙ্গীত শুনতে পেয়ে ঠাকুর তার প্রশংসা করেছিলেন। মহিলা ভক্তরা অনেকসময় ঐ ঘরে মায়ের সঙ্গে রাত্রে থেকেও যেতেন। তাঁদের কেউ ছোট ঘরটির দরজার দুদিকে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বলতো, 'আহা! কি ঘরেই আমাদের সতীলক্ষী আছেন গো—যেন বনবাস গো।'

মা সন্তান সন্ততিদের জন্য এতটাই উদ্বিগ্ন ছিলেন যে তাঁর বাণীতে আমরা প্রবলভাবে দেখতে পাই—আর শান্তি পাই এই দেখে.... তিনি উপদেশে বলছেন— সবসময় জানবে, ঠাকুর তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন।

"আমি মা রয়েছি, আমি মা থাকতে তোমাদের ভয় কি? আর কেউ না থাক, জানবে তোমার মা, তোমার সাথেই আছেন। আমি থাকতে আমার সন্তানদের কোনো ক্ষতি হবে না।"

আমাদের অন্তরে সেই দ্বীপের আলো প্রজ্বলিত হয়ে উঠুক মাতৃনামের অন্তরালে থেকে কারণ ঠাকুর মা এসে যে আলো বিকশিত করে গেছেন তা থেকে আমরা আমাদের আধার অনুযায়ী নিজেদের প্রদীপের আলো ধরিয়ে নিই। যাতে করে আমরা আমাদের জীবনকে এক আধ্যাত্মিক পথে চালিত করতে পারি। তা না হলে আমাদের এই মনুষ্য জীবন পেয়ে তার অবমাননা করে থাকব, কিন্তু ঠাকুর এসে তাঁর বাণীতে বলছেন মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। এই ঈশ্বরলাভ করতে গেলেই আগে নিজেদেরকে আলোর মুখাপেক্ষী করে উঠতে হবে তা না হলে আমাদের এই দীপকে জ্বালাবোই বা কি করে, তাই তাঁদের প্রদীপের আলো থেকে আমাদের প্রদীপ জ্বালাতে গেলেই গুরুকরণের মাধ্যমে আমরা ইষ্টমন্ত্রের কৃপা লাভ করতে পারবো। শ্রীগুরুমহারাজ আমাদেরকে সেই ভাবেই পথে চালিত করবেন ঠাকুরের বাণীকে কেন্দ্র করেই আর শুধু মনে প্রাণে শ্রীমায়ের শ্রীচরণে মাথা রেখে এই প্রার্থনাই করি। ❑

(পূর্ব প্রকাশিতের পর) সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩।১০।২০১৬—সকালে ঘুম ভাঙে, যেহেতু গাড়ি আগে থেকেই বলা ছিল অতএব সাতটার সময় গাড়ি এসে দাঁড়ায়। আমরা উঠি গিয়ে। প্রথম গন্তব্য গৌহাটির প্রাণপ্রতিমা দেবী কামাখ্যা।

গৌহাটির থেকে দূরত্ব ১০ কিলোমিটার। নীলাচল পাহাড়। প্রায় ৫২৫ ফুট উঁচুতে শিবপর্বতে দেবী কামাখ্যার মন্দির। মন্দিরের বেশ কিছুটা দূরে গাড়ি দাঁড়ায়। কিছুটা পথ পায়ে হেঁটে ওপরে উঠতে হয়। দুধারে ফুল বা পূজার উপকরণের দোকান। সেসব দোকান পেরিয়ে মূল দরজা দিয়ে প্রবেশ করি মন্দিরে। একটি দোকানে জুতো ছেড়ে সেখান থেকেই মন্দিরে দেবীকে পুজো দেওয়ার উপচার সংগ্রহ করি। এখানে মূলতঃ শুকনো ফল বা এলাচদানা প্যাকেটে করে বিক্রি করা হচ্ছে। বিশাল লাইন, রয়েছে পাণ্ডাদের ভীড়। সাধারণ লাইনের যা অবস্থা তাতে সকাল ৮ টায় দাঁড়ালে বেলা ২ টোর আগে মন্দিরে ঢোকবার সম্ভাবনা নেই। অতএব ৫০০ টাকা দিয়ে ভি. আই. পি. লাইনেই দাঁড়াই। একটি বিশাল হল ঘরের দোতলায় বসবার জায়গা। প্রথমে ওপরে বসি। ভারতবর্ষের নানাপ্রান্তের বেশ কিছু মানুষ এসেছেন। সেখানে বসে যেন দেখতে পাই মিনি ভারতবর্ষকে। বিদেহরাজ জনকের পুত্র নরক কামরূপ জয়ের পর কালাপাহাড়ের হাতে ধ্বংস হয়। এরপর কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণ মন্দির গড়ে তোলেন। পরবর্তীতে ভূমিকম্পতে এই মন্দির বিধ্বস্ত হয়। মন্দিরের শিখর অত্যন্ত সুদৃশ্য। আকার ডিম্বাকৃতি। ৭ টি চুড়ো রয়েছে। রয়েছে পদ্মফুলের ওপর ৩০টি সোনার কলসী। এই কলসীর ওপর সোনার ত্রিশূল শোভা পাচ্ছে। মন্দিরের দেওয়ালে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি খোদাই করা আছে। নটরাজ, বিশ্বকর্মা, প্রমুখ দেবতার মূর্তির সুষমা অনন্য। দেবী কামাখ্যা দশমহাবিদ্যার দুর্গা, কালী, বগলা, তারা, কমলা, চামুণ্ডা, উমা এসবের প্রতিভূ। ৫১ পীঠের অন্যতম এক পীঠ এই মন্দির। কথিত আছে, সতীর যোনি এই স্থানে পড়ে। ভারতে একমাত্র কামাখ্যাতেই যোনীপুজোর প্রচলন রয়েছে। অম্বুবাচীর সময় মহাসমারোহে পালিত হয় দেবী কামাখ্যার ঋতুমতী হওয়ার উৎসব। আমাদের লাইন এগোয়। দ্বার দিয়ে প্রবেশ করি মূল মন্দিরে। ভেতরটা আলো আঁধারি। সামান্য আলোতেই সিঁড়ি বেয়ে আমি নীচে নামি। যে বেদীতে দেবীর যোনিমূর্তি পূজিত হচ্ছে তার ফাটল ফুঁড়ে বয়ে চলেছে ঝরণা। এই ঝরণার জলপান করলে হয় মোক্ষলাভ। আমরা সারিবদ্ধভাবে এই মূর্তি প্রদক্ষিণ করি। পবিত্র হৃদয়ে স্পর্শ করি দেবীর বিগ্রহ। সকাল ৮ টা থেকে। সূর্যাস্ত পর্যন্ত এই মন্দির খোলা। তবে দুপুর বেলায় ১ টা থেকে ২ ঘন্টার জন্য মন্দির বন্ধ থাকে। কেমন যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত দর্শনকরি কামাখ্যা। সরু অপরিসর হলেও কোন হট্টগোল নেই। তিন বছরের শিশুও যেন কাঁদতে ভুলে গেছে। আবার অশক্ত অশীতিপর বৃদ্ধা নিজের জ্বালা যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে অর্জন করেছেন সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাহস। মন্দিরের কাছেই রয়েছে সৌভাগ্যকুণ্ড। সেই কুণ্ডে অনেকেই স্নান তর্পণ করে প্রবেশ করেন মন্দিরে।

মন্দির চত্বর থেকে বেরিয়ে আমরা চলি পরের গন্তব্যে। গাড়িতে ওঠার আগে পুরী তরকারী ও চা সহ জলখাবারের পালা চোকাই। ২৫ টাকায় সুন্দর পুরী তরকারী ও দশ টাকার চা খেয়ে পরিতৃপ্ত হই। আমাদের পরের গন্তব্য উমানন্দ মন্দির।

উমানন্দ মন্দিরে গিয়ে আমাদের রথ দেখা ও কলা বেচা দুই হল। এমনিতে এতটাই সময় কম তাই আলাদা করে স্টিমার চড়ে ব্রহ্মপুত্র নদীর বুকে আর ঘোরা হবে না। অতএব মাত্র ১০—১৫ মিনিটে লঞ্চে করে ব্রহ্মপুত্রর একপার থেকে অন্যপারে উমানন্দ মন্দির দেখা হবে। ব্রহ্মপুত্রের তীরে আছে কাছারি প্রাঙ্গণ। সেখান থেকেই রয়েছে লঞ্চ ছাড়ার বন্দোবস্ত। উল্টো দিকে ছোট্ট দ্বীপ ভস্মাচল বা ভস্মকূট। এই ভস্মকূটের বর্তমান নাম পিকক আইল্যাণ্ড। এখানেই পাহাড়ী পথ বেরিয়ে বেশ খানিকটা উঁচুতে উমানন্দ মন্দির।

উমানন্দ মন্দিরে উঠতে গেলে খাড়াই সিঁড়ি টপকাতে হয়। এই মন্দিরের অন্তরালে যে কাহিনীটি রয়েছে তা এরকম যে শিবের রোষানলে কামদেব বা মদন এখানেই ভস্মীভূত হন। সেই মদন ভস্মের স্মৃতি নিয়ে বিরাজিত এই মন্দির ১৬৬৪ সালে নির্মিত। এখানে শিবের মূর্তি রয়েছে। মন্দির

প্রাঙ্গণ বড় শান্ত। বিশেষ কেউই যে এখানে আসেন এমনটা বলা যায় না। শিবরাত্রির সময় অসংখ্য ভক্ত এখানে আসেন। ঐ মন্দিরের কাছাকাছি রয়েছে সঙ্কট-মোচন মন্দির। আবার বহ্মপুত্রতে লঞ্চে করে ঘোরা। অপর পারে এসে পড়া। গাড়িতে বসে পরবর্তী গন্তব্যের দিকে চলে যাওয়া।

আসামের স্টেট মিউজিয়াম দেখবার খুব ইচ্ছা ছিল কিন্তু তখন টিফিনের সময় তাই দেখা হল না।

—চলুন। আপনাদের আরও একটা জায়গায় নিয়ে যাই। এখানে গেলে সারাদিনটা কেটে যাবে। ড্রাইভার বলেন আমাকে। তখনও জানি না কোন্ এক বিস্ময় আমাদের জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে। শঙ্কর কলাক্ষেত্র। যদি এখানে না আসতাম তাহলে আসামের জনজীবন তথা সমগ্র উত্তর পূর্বভারতের চলমান জীবনযাত্রার একটা বড় অধ্যায় বাকী থেকে যেত। বিশেষ করে আসাম তথা পার্শ্ববর্তী রাজ্য গুলির সংস্কৃতি ও শিক্ষার প্রদর্শন যেভাবে এখানে প্রদর্শিত হয়েছে তা প্রকৃতই অরণ্য। এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মধ্যে গড়ে উঠেছে এই সংগ্রহশালা। সুরম্য উদ্যান, ললিত কলাভবন, দুখানি সংগ্রহশালা, অসম সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করবার স্থান, ভোজনালয় তথা বিভিন্ন স্থাপত্য ভাস্কর্যের নিদর্শন এই সংগ্রহশালার পরতে পরতে জড়িয়ে রয়েছে। ঘাসের উদ্যানের ওপর আসামের বিভিন্ন লোকবাদ্য ও তার বাজনদারের মূর্তি স্থাপিত রয়েছে। পাশাপাশি দেয়ালে বিভিন্ন লোকনৃত্য মুরালের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়েছে।

ডঃ ভূপেন হাজারিকা আর আসাম অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত। সারাজীবন যে মানুষটি আসামের সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটালেন তিনি ভূপেন হাজারিকা। আসামের সঙ্গে বাংলা ও হিন্দীতে তাঁর গাওয়া যে কত গান রয়েছে তা আর বলবার অপেক্ষা রাখে না। সেই কোন পাঁচের দশকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দ্বৈতসংগীত দিয়ে তাঁর বাংলা গানের জগতে আত্মপ্রকাশ তারপর কত না ছবিতে তাঁর সুর বা কতই না শিল্পীর গলায় তাঁর সুরের গান এবং সর্বোপরি তাঁর নি জের গাওয়া গান আমাদের সম্পদ। জীবন-তৃষ্ণা, কড়ি ও কোমল, চামেলী মেমসাহেব, গজমুক্তা বা হিন্দীতে রুদানি দরমিয়া। এমন অজস্র ছবিতে তাঁর সুরারোপিত গান আমাদের মুগ্ধ করেছে। লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, আরতি মুখোপাধ্যায় এবং আরও কত না শিল্পী তাঁর সুরে গেয়েছেন গান। আমি এক যাযাবর, মানুষ মানুষের জন্য, দোলা এ দোলা, বিস্তীর্ণ দুপারের ইত্যাদি গান গেয়ে ডঃ ভূপেন হাজারিকা আপামর বাঙালিকে হাসিয়েছেন, কাঁদিয়েছেন। সারাজীবন মানুষের অধিকার রক্ষার আন্দোলনে ছিলেন এই শিল্পী। সেই শিল্পীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছে একটি সংগ্রহশালা। শ্রদ্ধেয় শিল্পীর সঙ্গে ভারতবর্ষ ও বিশ্বের বহু বিখ্যাত মানুষের ছবিও প্রদর্শিত হচ্ছে। তাঁর বসবার ঘর ও সংগীতের ঘরের অনুকরণে রাখা হয়েছে ছোট্ট ছোট্ট দুটি কক্ষ। সর্বোপরি রয়েছে সেই কফিন বাক্স যেটি করে নিয়ে আসা হয়েছিল তাঁর মরদেহ যদিও তিনি বম্বেতে থাকতেন কিন্তু তাঁর শেষকৃত্য শিল্পীর ইচ্ছানুযায়ী সম্পন্ন হয়েছিল গৌহাটির জালুকবাড়ি শ্মশান ঘাটে। আসামের মাটির সুরের পরশ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়ে ডঃ হাজারিকা মিশে রইলেন আসামের মাটিতে। এখানে ছবি তোলা ও কথাবার্তা বলা বারণ। এবার আমরা দেখি আসাম সহ সমগ্র পূর্ব ভারতের লোক সংস্কৃতির একটি প্রদর্শন কক্ষ। সেই সংগ্রহ শালাটিও খুব বড় এবং বেশ কয়েকটি তলা জুড়ে। আমরা অনেক সময় বিদেশী সংস্কৃতি ও বিভিন্ন বিনোদন নিয়ে বড় বেশী মাথা ঘামাই কিন্তু দেশীয় ঐতিহ্য বিশেষ করে এই পূর্বাঞ্চলীয় সংস্কৃতি যে কতটা সমৃদ্ধ তার খবর রাখি না। এই সংগ্রহ শালায় সেই বিষয়টি দেখে মুগ্ধ হই। পূর্ব ভারতের নানা উপজাতি, তাদের জীবন জীবিকা, সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস, পোষাক, অস্ত্রশস্ত্র এবং প্রত্নতাত্ত্বিক নানা নিদর্শন এখানে রয়েছে। এই অঞ্চলের কুটীর শিল্পও যথেষ্ট উন্নত তারও কিছু কিছু নমুনা আমরা দেখি। যেহেতু আমাদের হাতে সময় বেশ কম তাই সব কিছুতে যে সংযোগ করতে পেরেছি এমনটা নয়। কিন্তু যেটুকু দেখলাম তাও তো কম নয়। সর্পোপরি এখানকার খাওয়ার ব্যবস্থা দেখে বেশ ভালো লাগে। মাত্র ৪০ টাকায় উৎকৃষ্ট চাউমিন খেয়ে পরিতৃপ্ত হই। এখানকার পরিবেশ খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। যে সব কর্মীরা এখানে কাজ করছেন তাঁরা এখানকার পরিবেশের সাফ সুতরো করে রাখবার ব্যাপারে যথেষ্ট যত্নবান। আমাদের দেখা শেষ হয়। আমরা

চলি পরবর্তী গন্তব্যের দিকে।

আমাদের পরবর্তী গন্তব্যের নাম বশিষ্ঠ মুনির আশ্রম। মূল শহর গৌহাটি থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সন্ধ্যাচল পাহাড়। সেই পাহাড়ে অবস্থিত রয়েছে বশিষ্ঠ মুনির পবিত্র আশ্রম। শোনা যায় যে, মহর্ষি বশিষ্ঠর তপোবন আশ্রম ছিল এখানে। মন্দিরে রয়েছে বশিষ্ঠ মুনির পায়ের ছাপ। এছাড়াও রয়েছে মূর্তি। মূলমন্দিরের চত্বরে দাঁড়ায় গাড়ি। সেখান থেকে সিঁড়ি বেয়ে উঠে পৌঁছতে হয় মন্দিরে। মন্দিরে ঢোকার মুখে বেশ কিছু হনুমান কিন্তু তারা কোন ভাবেই দর্শনার্থীদের বিরক্ত করে না। আশ্রমের ভেতরে প্রণাম করে পেছনের দিকে যাই। সেখানে চোখে পড়ে এক অপূর্ব দৃশ্য। তিনটি পাহাড়ী ঝোরা একত্রে মিলিত হয়ে নেমে এসেছে। এই ঝোরা তিনটির নাম যথাক্রমে সন্ধ্যা, ললিতা ও কান্তা। এই ঝোরার মিলনে বশিষ্ঠ গঙ্গার সৃষ্টি হয়েছে। শোনা যায় যে, এই গঙ্গায় অবগাহন করে স্বয়ং বশিষ্ঠ মুনি শাপমুক্ত হয়েছিলেন। এই মন্দির সংলগ্ন শিবমন্দিরটি দেখে চমৎকৃত হই। ঝরণার পরিচ্ছন্নতা দেখে মুগ্ধ হই। আমরা গাড়িতে গিয়ে বসি।

এবার গন্তব্য আসামের কটেজ ইণ্ডাস্ট্রি। আসামে আসব আর এখানকার কুটীর শিল্পের নমুনা সংগ্রহ করব না সে তো হয় না। অতএব আমরা চললাম আসামের কুটির শিল্পের প্রধান কেন্দ্র পূর্ব শ্রীতে। সেখানে রয়েছে বাঁশের কাজের নানারকম নমুনা। রয়েছে আসামের পোষাক, চা এবং আরও কত কি। দামও সাধারণের সাধ্যের মধ্যে। সেসব দ্রব্যাদির কিছু কিছু সংগ্রহ করি। চলি হোটেলের দিকে। হোটেলে পৌঁছে ঘরে গিয়ে তরতাজা হই। চা জলখাবারের পালা চুকিয়ে আমাদের হোটেলের কাছাকাছি পল্টনবাজারে আসামের প্রসিদ্ধ শাড়ির দোকানে ঢুকি। আসাম সিল্কের শাড়ির দামও প্রচুর। কিন্তু অপূর্ব তার নকশা ও গুণগত মান। সংগ্রহ করবার ইচ্ছা থাকলেও তা হয়ে ওঠে না। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরি হোটেলে। রাতের খাবারের পালা চুকিয়ে বিছানায় যাই। আজই আমাদের গৌহাটিতে থাকা শেষ হবে। আগামীকাল আমরা পৌঁছে যাব শিলঙে। আসাম ছেড়ে প্রবেশ করব মেঘালয়ে।

১৪।১০।২০১৬ শুক্রবার। ড্রাইভার ধনতি গাড়ি নিয়ে হোটেলের সামনে আসে সকাল দশটায়। আমরা প্রস্তুত হয়ে গিয়ে বসি গাড়িতে। গাড়ি চলতে শুরু করে শিলঙের উদ্দেশ্যে।

শিলং মেঘালয়ের রাজধানী। মেঘালয় শব্দের অর্থ মেঘেদের আলয়। ১৯৭২ সালে ৫ টি জেলা নিয়ে এই রাজ্যের আত্মপ্রকাশ। পাহাড় অরণ্য তৃণভূমি এসব নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী রাজ্য বিদ্যমান। একদিকে সবুজপাহাড় এবং অন্যদিকে বিস্তৃত তৃণভূমি মেঘালয়কে সৌন্দর্যপ্রদান করেছে। অর্কিড, মথ ও প্রজাপতির সম্ভার নিয়ে মেঘালয় আমাদের বড় কাছের। ছোটবেলায় ভূগোলে পড়েছিলাম যে খাসি, জয়ন্তিয়া ও গারো এই তিনটি পাহাড়ের সম্মিলনে মেঘালয় গঠিত। এই তিনটি সম্প্রদায়ের বসবাস এখানে। প্রধানতঃ সমাজ মাতৃতান্ত্রিক। আসামের গুয়াহাটি হয়ে যে সড়ক পথ গিয়েছে আমরা চলেছি সেই পথ দিয়েই।

প্রবেশ করি মেঘালয় রাজ্যে। পাকদণ্ডীপথ। পথের ধারে ধারে অসংখ্য ফলের দোকান। বিশেষ করে আনারস, কমলালেবু, কলা ও কিউই ফল মেঘালয়ে প্রচুর পাওয়া যায়। বেশ কিছুটা পরে আমরা প্রবেশ করি শিলঙে।

শিলং নামকরণ নিয়ে কিছু কিছু তথ্যের অবতারণা করা যায়। খাসিয়াদের গৃহদেবতা Ubtei Shnlong চাষীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজস্ব দক্ষতায় Shyllong (Hima Shyllong) নামে রাজ্যটি গঠন করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে এই শিলং ভারতের অন্যতম একটি শৈলশহর হিসাবে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। ১৪৯৬ মিটার উঁচুতে এই শিলং অবস্থিত। ব্রিটিশরা ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি শিলঙে আসে। এখানকার জলবায়ু একদম ইংলণ্ডের মত। জলবায়ু মনোরম। অসংখ্য হ্রদ, জলপ্রপাত, সুদৃশ্য বাড়ি, পরিচ্ছন্ন পথঘাট সর্বোপরি আধুনিক বাজার—এসব নিয়ে শিলং স্বাগত জানায় আমাদের।

—নামুন এসে গিয়েছে উমিয়াম লেক। ড্রাইভার ধনতির কথায় চমকে উঠি। আমরা দাঁড়িয়ে আছি সুবিস্তৃত একটি হ্রদের সামনে। শিলং বললেই যে কটি দর্শনীয় বস্তুর কথা মনে পড়ে যায় তার একটি হল এই উমিয়াম লেক।

বাঁধ দিয়ে জলাধার গড়ে এখানে তৈরি হচ্ছে জলবিদ্যুৎ। এই লেকের আরও একটি নাম হল চড়াপানি। চারপাশে পাহাড় দিয়ে ঘেরা রয়েছে। জলের রঙ নীল। শোনা গেল যে প্রথম ওয়াটার্স স্পোর্টস কমপ্লেক্স তৈরি হয়েছে উমিয়াম লেকে। আশে পাশে ছবির মত বেশ কিছু রিসর্ট রয়েছে। আবার মাছও ধরা যায়। সেই লেকের ধারে দোকান গড়ে উঠেছে। খাসি রমণীরা সেখানে বিক্রি করছেন খাদ্যবস্তু ও পণ্যসম্ভার। অনেকেই আবার ধরছেন মাছ। উমিয়াম লেকের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হই। গাড়িতে এসে বসি। এবার যাব হোটেলে। শিলঙের গীর্জা সংলগ্ন লাবান অঞ্চলে হোটেল পাইন বদ্রক। সেখানেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা। পাশেই রয়েছে একটি চীনা খাবারের দোকান। আমরা সকলেই ক্ষুধার্ত। তাই বিলম্ব না করে সেই দোকানে চীনা খাবার সহযোগে মধ্যাহ্ন ভোজন সারি। এখানে পরিবহনের মাধ্যমে হল ট্যাক্সি। সেই ট্যাক্সি চড়ে যাই পুলিশ বাজারে। জনপ্রতি ১০ টাকা দিয়ে উঠতে হয়। সেই ট্যাক্সিতে। পুলিশ বাজার বেশ জমজমাট। এই জমজমাট জায়গায় অজস্র হোটেল। রয়েছে অসংখ্য দোকান। সেই সব দোকানে বিক্রি হচ্ছে স্থানীয় কুটির শিল্প এবং পাশাপাশি আছে গরম পোষাক। খানিকটা ঘুরে ফিরি হোটেলে। বেশ ঠাণ্ডা অনুভব হচ্ছে। ঘরে গিয়ে চোখ রাখি টিভিতে। আগামীকাল আমরা শিলঙের স্থানীয় দ্রষ্টব্য স্থান ঘুরে দেখব। (ক্রমশঃ)

তোমার গানে গানে

ফটিক চৌধুরী

একটি প্রভাত মুখরিত হয় পাখির কলতানে
একটি প্রভাত পুলকিত হয় প্রভুর গানে গানে।
একটি শিশু উঠে দাঁড়ায় ছোট্ট ছোট্ট পায়ে
একটি মানুষ শীত ঢেকে নেয় একটি চাদর গায়ে।
একটি বালক বিকশিত হয় নিজের নিয়ম নিষ্ঠায়
একটি জায়গা দূষিত হয় জঞ্জাল ও বিষ্ঠায়।
একটি দিবস পূর্ণ হয় সূর্য গেলে অস্তে
একটি জীবন পূর্ণ হয় গেলে বানপ্রস্থে
একটি সন্ধ্যা পবিত্র হয় দিয়ে সন্ধ্যারতি
একটি প্রাণ বেগবান হয় পেলে আপন গতি।
জীবনের এই বারমাস্যা ক'জনই বা জানে!
সবার জীবন সার্থক হোক তোমার গানে গানে। ❑

মানুষই শেষ কথা নয়

রিক্তা দত্ত

"দাও ফিরে সে অরণ্য" বলে
মানুষ অনেক কাব্য করেছিল
অত্যাধুনিক হতে গিয়ে হয়েছে
অরণ্যহারা অমানুষ
বড্ড বাড় বেড়েছিল সে
রাশ টেনে দিল প্রকৃতি-ই
সবার উপরে মানুষ সত্য
কথাটা এক্কেবারে ভুল প্রমাণিত
করলো প্রকৃতি
সে বড়াই না করেও রাজা বনে গেল
এক লহমায়।
আজ ছাতার, হাঁড়িচাচা, শুঁয়োপোকারা
খোশমেজাজে তাদের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে
বাবুই-বাসায় আবার জোনাকি জ্বলছে
ঘুলঘুলিতে আবার চড়াই নতুন করে
বাঁধছে বাসা, প্রজাপতি উড়ছে
নীল গাই হরিণ ময়ূর
কাকের মত ছড়িয়ে পড়েছে
হয়তো শিয়ালও ডাকবে হুক্কাহুয়া
আর মানুষ?
সবুজের বাড়বাড়ন্তে নিঃশ্বাস নিচ্ছে প্রাণ ভরে
একসাথে বাঁচতে ধীরে ধীরে
একটু একটু করে সে
আদিম হচ্ছে আদম-ইভে। ❑

সৎ হবার মূলে থাকা দরকার Will to be good, ভাল হবার এক বলিষ্ঠ ইচ্ছা—একটা বিরাট Dynamicism.

—শ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেব

তোমরা পূজার ঘরটিকে ধূপে, সুরভিতে, ফুলে, নামে, গানে, ঠাকুরের মূর্তিতে এমন করে ভরিয়ে রাখবে—যেখানে ঢুকলেই মনটা আপনি উঁচু স্তরে উঠে যাবে।

—শ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেব